মজুর এবং গুরু

পুঁজি গঠনে, পণ্য উৎপন্নে মজুরির বিনিময়ে শ্রম শক্তি বিক্রিকারী হচ্ছে মজুর। " পণ্যের অবয়ব গঠিত হয় দুরকম পদার্থের সমন্বয়ে– প্রাকৃতিক বস্তুর ও শ্রমের। " পুঁজি, মার্কস। প্রাকৃতিক বস্তুর ব্যবহার মূল্য থাকলেও বিনিময় মূল্য নাই। তাই, পণ্যের দাম নির্ধারণে প্রকৃতির কোনো ভূমিকা নাই। সুতরাং– " পণ্যের ভিতর যে শ্রম বাস্তবায়িত থাকে তার অর্থ নাম হল দাম"। –পুঁজি, মার্কস। শ্রমিক যখন কর্মরত থাকে, তখন শ্রম–শক্তি যা ছিল গতি, ব্যবহারের মাধ্যমে তাই হয়ে পড়ে গতিহীন বস্তু। মজুরের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া বা ব্যবহার হচ্ছে শ্রম। মজুর তার শ্রম–শক্তির ক্রেতার নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তাই, যখন মজুর তার শ্রম–শক্তির ব্যবহার তথা শ্রম করে তখন সেই শ্রম হয় পুঁজিপতির সম্পত্তি। কাজেই, যে সময় হতে মজুরের শ্রম–শক্তির ক্রিয়া– শ্রম কার্যত শুরু হয় সেসময় হতে সে শ্রম আর তার নেই; সুতরাং, মজুর শ্রম বিক্রি করতে পারে না। আবার, পুঁজিপতি শ্রমকে জীবন্ত রসায়ন হিসাবে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণহীন উপাদানগুলির সাথে মিশিয়ে দেয়। তাই, পণ্যের দাম হচ্ছে পণ্যে নিষিক্ত শ্রম। " শ্রম হচ্ছে মূল্যের সারবস্তু এবং তার অন্তর্নিহিত পরিমাপ , কিন্তু তার নিজস্ব কোনো মূল্য নাই।"– পুঁজি, মার্কস। অথবা, "মূল্য রূপে সমস্ত পণ্যই হল ঘনীভূত শ্রম–সময়ের বিশেষ বিশেষ পরিমাণ মাত্র।" পুঁজি, মার্কস।

পণ্য উৎপন্ন কালে মজুরেরা তাদের শ্রম–শক্তি বিক্রিকালীন সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের মজুরির সম–পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন করে। কিন্তু, তাকে শ্রম দিতে হয় চুক্তিকৃত অবশিষ্ট বা অতিরিক্ত সময়েও। এই উদ্বৃত্ত–সময়ের শ্রমের জন্য পুঁজিপতিকে কোনো ব্যয় করতে হয় না। তাই, এই উদ্বৃত্ত–সময়ের শ্রমে উৎপন্নকৃত মূল্যের জন্য কোনো ব্যয় করে না পুঁজিপতি। কিন্তু,এই উদ্বৃত্ত–সময়ে উৎপন্ন মূল্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত–মূল্যের মালিক বটে পুঁজিপতি। সুতরাং, উদ্বৃত্ত–সময়ের শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত–মূল্য যার মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি তা হচ্ছে

পুঁজি। কাজেই, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং, শ্রম শক্তির মূল্য এবং তার ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট মূল্য এই দুইয়ের মধ্যকার ফারাক হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি- যা হচ্ছে অপরিশোধিত শ্রম । তাই, পুঁজি হচ্ছে শোষণের ফল।

পুঁজিতন্ত্রও ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ বলেই পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়গুলির মালিক বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। এই উপায়ের মালিক বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজি গঠনে, পণ্য উৎপন্নে ক্রয় করে মজুরের শ্রম-শক্তি। পণ্য উৎপন্নে শ্রম-শক্তির দাম পরিশোধ করে উৎপাদিত পণ্যটির মালিক হয় বটে মজুরের শ্রম-শক্তির ক্রেতা-পুঁজিপতি। অন্যান্য উপকরণের সাথে জমাটবদ্ধ শ্রমই পণ্যটির দাম হলেও মজুরের উদ্বৃত্ত সময়ে উৎপন্ন পণ্যের জন্য শ্রম-শক্তির ক্রেতা-পুঁজিপতিটি কোনো ব্যয় না করেও পুরো পণ্যটির মালিক হয়। তাই, মজুরের উদ্বৃত্ত-সময়ে উৎপন্ন অংশটি অর্থাৎ পণ্যের অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে পুঁজি।

তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী অর্থাৎ যে শ্রেণীটি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার হেতুবাদে মুনাফা, খাজনা, সুদ ইত্যকার নামে মজুরের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগী তথা পুঁজির মালিক সেই শ্রেণীটি হচ্ছে মজুরের শোষক, শাসক, নিপীড়নকারী, দমনকারী, দুর্ভোগ ও দুর্দশা সৃষ্টিকারী।

আর মজুর শ্রেণী হচ্ছে শোষিত, শাসিত, নির্যাতিত, দুর্ভোগ ও দুর্দশাগ্রস্ত। তাই, মজুরেরা শোষণ, শাসন সহ এসব দুর্ভোগ-দুর্দশা হতে মুক্তি চাইবে-এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, মজুরেরা সংগ্রামী এবং সংগ্রাম করবে তারা তাদের মুক্তি তথা শোষণ-শাসন, দমন-পীড়ন, দুর্ভোগ ও দুর্দশা বিলীন ও অবসানে- এটাই মজুরির শর্তে শর্তাধীন বিষয় মজুরের ।

পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন হচ্ছে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাবলী। পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন বিশ্বকে জয় করে সমগ্র বিশ্বে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি চালু করে একটি বিশ্ব বাজারের প্রতিষ্ঠা করে নিজেরাই বিশ্ব বাজারের নিয়মের অধীন হয়েছে তেমন শ্রম-

শক্তির বিক্রেতা বলে মজুরেরাও বেচা-কেনার বিশ্ব বাজারের অধীন। উল্লেখ্য, কোনো দেশ-জাতি যেমন পণ্য বা পুঁজি উৎপন্ন করে না, তেমন কোনো দেশ-জাতিও মজুর শ্রেণীকে জন্ম দেয় নাই বরং পুঁজিপতি শ্রেণীই পণ্য তথা পুঁজি উৎপন্নে মজুরি শ্রমিক উৎপন্ন করে। পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে অতঃপর, বিশ্ব বাজারের অধীনতা হেতু পুঁজিপতির যেমন দেশ-জাতির গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ নাই তেমন পণ্য তথা পুঁজি উৎপন্নকারী অর্থাৎ শ্রম-শক্তি বিক্রেতা-মজুরেরও স্বীয় শৃংখল হারিয়ে জয় করার মতো একটি বিশ্ব থাকলেও তাদের কোনো দেশ নাই, জাতি নাই।

শ্রম-শক্তি বৈ মজুরের চামড়ার রং, লিংগ বা ভাষা ইত্যকার বিষয়াদি পণ্য উৎপন্নে বিবেচনার বিষয় নয়। মজুর,পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে উপযুক্ত কিনা তাহাই শ্রম-শক্তির ক্রেতা- পুঁজিপতির বিবেচ্য বিষয়। জটিল বা কঠিন নয় বরং পণ্য উৎপাদন প্রণালী হচ্ছে সহজ ও সরল ; আবার একক কারো শ্রমে নয় বরং পণ্য উৎপন্ন হয় অনেকের সম্মিলিত শ্রমে এবং পণ্য বেচা-কেনা সহ পণ্য ভোগ-ব্যবহারে কার্যত পুরো সমাজ জড়িত। তাইতো, কার্যত দুনিয়ার কোনো দেশই এককভাবে কোনো পণ্য উৎপন্ন করতে যেমন পারে না তেমন পণ্যকে বিক্রি করে পণ্যের অর্থে রূপান্তর তথা পুঁজি গঠন করতে পারে না। আবার, শ্রম যেমন সমতাধর্মী তেমন পণ্য উৎপন্নে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখানোরও সুযোগ নাই। তাই, মানুষে মানুষে যে সমান এই বোধ বা চিন্তার উদ্ভব হয় পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়। মজুরেরাও তাদের পণ্য উৎপাদনী ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ধারণাও পেয়ে থাকে।

তবে, ব্যক্তিমালিকানার কারণেই খোদ পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে কেবল প্রতিযোগীতায়ই লিপ্ত নয় বরং প্রতিযোগিতার শর্তেই নিজেরাই নানান বৈষম্য-বৈরীতা ও শত্রুতার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাও একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা হলেও এটি সমানতালে দুনিয়ার সর্বত্র যেমন বিকশিত হয়নি, তেমনি হালে পুঁজিতন্ত্রের মরণকালেও এটি একটি অসমান ও বৈষম্যপূর্ণ ব্যবস্থাই।

প্রাণী কুলের মধ্যে মানুষই নিজেদের খাদ্য-দ্রব্য, পরিধেয়, উৎপন্ন ও সংরক্ষণ করতে পেরেছে। প্রকৃতিজাত প্রাণী হয়েও হালে পুঁজিতন্ত্রে, প্রকৃতিকে বশীকরণ করছে এই মানুষেরাই কার্যত পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে। কিন্তু, তাতো ১ বা ২ শতকে মানুষ করেনি। জানা মতে মানবজাতির বয়স ২ লাখ বছরের কম নয়। কিন্তু, মানুষ মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে দাসসমেত প্রাকৃতিক সম্পদ- ভূমিতেও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন করার বয়স এখনো ৬ হাজার বছর হয়নি। তাই, ৬ হাজার বছর আগের আদিম মানুষেরা যেমন জানতো না সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা তেমন তারা বিবর্তনের নানান স্তর পেরিয়ে এলেও দুনিয়ার আর কোথায় আর কে কে বসবাস করছে তা আজকের মতো জানার সুযোগও ছিল না, জানার দরকারও ছিল না এবং জানত না বটে আকার-আকৃতি সমেত দুনিয়াটাকেও । শুরুতেতো বন্য পশুদের একটি প্রজাতি হিসাবে বন্য জীবনে থেকেছে মানুষ। মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ধরণ ও উপকরণও বদল হয়েছে দৈহিক অবস্থার পরিতর্নের মতোই। আগুন আবিষ্কারের পুর্বেতো মানুষও সিদ্ধ করা ছাড়াই অন্যান্য পশুদের মতোই খাবার খেত। তবে, অপরাপর, পশুদের মতো মানুষও যারা একই অঞ্চলে বাস করত তাদের মধ্যকার শিশু ও কর্মে অক্ষম ব্যতিত আর সকলেই সম্মিলিতভাবে খাদ্য বা অপরাপর সামগ্রী সংগ্রহ ও শিকার করত। প্রকৃতির রোষানল হতে নিজেদের সংরক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ ও ভক্ষণ বা পানীয় গ্রহণ বা আশ্রয়ের বিধি-ব্যবস্থা বা আশ্রয়ের পরিবর্তন করা বা হরমোনের প্রভাবেই দৈহিক মিলন ইত্যকার নানান কারণে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম- ভাষারও উদ্ভব হয় তবে তাদের ভাষায় শব্দ সংখ্যাও ছিল কম । দেহের নানান অংগ ভংগি সহ নানান প্রাণী বা প্রকৃতির নানান সৃষ্টি বিষয়ে নানান চিহ্ন বা প্রতীকও ব্যবহার করতে সক্ষম হলেও আদিম সামাজের মানুষ নিজেদের চিন্তা প্রকাশ ও সংরক্ষায় লেখা বা লেখার চিহ্ন তথা অক্ষর আবিষ্কার করতে পারেনি। একালে " ফ্রী লাভ " তথা মুক্ত মিলনের আন্দোলন করছে অনেকেই কিন্তু সেকালে মিলনে সকল সক্ষম ব্যক্তি অপরাপর পশুর মতোই মুক্তভাবে আচরণ না

করার কোনো কারণ ছিল না। যুথ বা সমষ্টিবদ্ধভাবে কয়েকজন বা কয়েকশ মানুষ একত্রে থাকলেও প্রত্যেকেই ছিল মুক্ত তবে প্রকৃতি বিষয়েও তেমন একটা কিছু জানত না। সমতা বা অসমতা বিষয়েও তারা অবজ্ঞাত ছিল না। কারণ, মানুষ কর্তৃক মানুষ শাসনের ভিত্তি ও কারণ- ব্যক্তিমালিকানা তখন ছিল না। তাই, মিলন সহ মানুষের জীবনাচরণেও মানুষ কর্তৃক প্রণীত বা কার্যকৃত কোনো প্রথা-নিয়ম বা বিধি-নিষেধ ছিল না। তবে, ছিল বটে প্রকৃতির নিয়মের অধীন। আবার নিরাবরণ মানুষদের নিজ দেহের কোনো অংগ বা অংশ ছিল না কারো প্রাইভেট বা গোপনাংগ বা হালের রাজনৈতিক বোধের লজ্জা বা শরমের অংগ। তাই, কেবলই অংগ বিশেষের জন্য কেউ ক্ষমতাবান পুরুষ আর কেউ দুর্বল নারী গণ্য হতো না। কেবলই অংগাদির অজুহাতে আজকের মতো কেউ কারো হিংস্রতার শিকার হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। নারী বা পুরুষ বোধের অংগ বিশেষ এখনো ইচ্ছে নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্ত হয়। তবে, হালে অংগ বিশেষ পরিবর্তনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলেও কথিত নারী অংগধারীরা কেবলই নিজেদের অংগ বিশেষের জন্য মানুষ নয় বরং দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নারী হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য হয়ে নিজের বিশেষ বিশেষ অংগাদিকে নিজেরই নিরাপত্তাহীনতার কারণ রূপ রাজনৈতিক বোধের আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয় বলেই বয়োঃসন্ধিকাল হতেই নিত্য এমনকি, নিজ গৃহেও ভয়ে ভীত ও শংকিত হয়ে জীবন কাবার করে। কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পত্তন ও তদভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজন তথা মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাগ ও বৈরীতার পূর্বে এরকম ভয়-ভীতি ও শংকার মধ্যে থাকতে হতো না কাউকে ।

অংগ সমূহের ক্রিয়াদি ঠিক-ঠাক মতো না জেনেও কতিপয় অংগাদির ভিত্তিতে তথা সেক্সের ভিত্তিতে মানব জাতিকে ভাগ-বিভাগ করতেই দাসতন্ত্রের গুরুজীদের প্রবর্তিত লিংগের রাজনৈতিক বোধের কারণেই কথিত নারী লিংগের মানুষদের নিজ নিজ বিশেষ অংগাদি তাদের নিজের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য হয়েছে। অথচ, অতীতে তথা আদিম সমাজেতো এই সব অংগধারীদেরকে এই সব অংগের কারণে

তেমন ধরণের শত্রুতার বোধ নিয়ে বাঁচতে হয়নি। কার্যত, দেহের কোনো অংগই কারো জীবনের শত্রু হতে পারে না। কিন্তু, দাসতন্ত্রের গুরুজীদের সৃজিত রাজনৈতিক বোধে এমনকি, কোনো নারীর স্তনও যদি স্বামি ছাড়া আর কেহ রমনের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করে তবে নিজেকে অপবিত্র বা অসতী বিবেচনা করে এমন কি স্বয়ং হতও হয় কেউ কেউ। আবার কোনো কোনো গুরুর মতবাদে বৈধ মালিক ব্যতিত আর কোনো পুরুষের সাথে মিলনে লিপ্ত হলে বা ভিন্ন কোনো পুরুষের কামের শিকার হলে সংশ্লিষ্ট নারীটিকেই নির্মমভাবে হত্যা করার বিধান বিদ্যমান।

অথচ,শিশুর দুধ উৎপন্নকরণের অংগ বৈ স্তন যৌন অংগ নয় তবে, মিলনকালে সমগ্র দেহই যৌনতায় উদ্বেলিত হয়। কিন্তু, এই স্তনেরও কতো রকম রসাত্মক বিবরণ বানিয়ে নারীকে ভারতীয় দলিতদের মতোই অস্পৃশ্য বানাতে কার্পণ্য করেনি গুরুবাদ। হরমোনজাত কারণেই দৈহিক মিলন একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং এখনো পর্যন্ত মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা তথা নবজাতক উৎপন্নের আবশ্যকীয় শর্ত বটে। অথচ, ব্যক্তিমালিকানা পত্তন করে তা রক্ষা ও সংরক্ষায় বৈধ উত্তরাধিকার জন্মানোর প্রয়োজনে স্বাভাবিক মিলনকে অতীব গোপনীয় তবে ভয়ানক বিশ্রী ও জঘন্য অংগের ক্রিয়া বলে সেসব বিষয় সাধারণ্যে উচ্ছারণকেও লজ্জাজনক বলে এদ্বিষয়ে নানান আকথা-কুকথা বা খারাপ কথামালা সাজিয়ে কেবল জীবনের স্বাভাবিক ক্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রণ করারই চেষ্টা করা হয়নি বরং এদ্বিষয়ক নিয়ম-নীতি বা বিধি-বিধান গ্রাহ্য, মান্য ও পালন না করলে যেসব শাস্তির বিধান দিয়ে নানান কানুনাদি বৈধকরণের রাজনৈতিক মতবাদ সাজিয়েছেন দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক বস বা গুরুজীরা সেসবের কারণে আজো স্বয়ংহত হওয়া সহ কতো ধরণের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে চরম দুর্ভোগ সহ নানান রকমের যন্ত্রণাময় জীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে কত জনকে।

প্রকৃতিজাত খাদ্যের উপরই প্রচীন সমাজের মানুষদের নির্ভর করতে হত বলেই খাদ্য অন্বেষণ ও বেঁচে থাকার মতো তাপনাকুল পরিবেশ

লাভে আদিম কালের মানুষদেরকে অভিবাসন করতে হয়েছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বা যেকোনো কারণেই এক গোষ্ঠী মানুষ আরেক গুষ্ঠী মানুষের মুখামুখি হলে এক পক্ষ অপর পক্ষকে চিনা বা জানার যেমন সুযোগ ছিল না, তেমন একে অপরের ভাষা বুঝার কোনো কারণ ছিল না। একে অপরকে খেয়ে ফেলবে কিনা তাও জানা-বুঝার সুযোগ ছিল না। কিন্তু, ওরা সকলেই এটুকু জানত যে বেঁচে থাকার জন্য যেমন প্রকৃতিজাত খাদ্য আবশ্যক তেমন প্রকৃতিজাত অনুকুল তাপও এবং তাপ বা আগুন জ্বালানোর উপকরণও। অতঃপর, অপরিচিত অভ্যাগতের কারণে তারা একে অপরের খাদ্য সামগ্রী হবে কি না বা পালিয়ে অন্যত্র চলে চলে যেতে পারবে কিনা বা থাকা-খাওয়ার উৎসকে তথা প্রত্যেক গোষ্ঠীর পরিচিত প্রাকৃতিক এলাকাকে অপর গোষ্ঠী কর্তৃক দখল হয়ে নিজেরাই নিজেদের এলাকা হতে বেদখল হওয়ার শংকা ও আশংকায় নিপতিত না হওয়ার কারণ ছিল না। ফলে, নিজ নিজ দলের অস্তিত্ব রক্ষায় এক দল অপর দলের সহিত সংঘর্ষ লিপ্ত না হওয়ারও কারণ ছিল না।

সংঘর্ষে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক। তবে,জয় বা বিজয় লাভই বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার শর্ত। অতঃপর, সংঘর্ষেই হিংস্রতার সূত্রপাত ও নিষ্ঠুরতার ধারণা লাভ করে মানুষ। সংঘর্ষে, কখনো কখনো বিবাদমান দুদলের লোকেরাই মারা যেত আবার কেউ কেউ সুযোগ পেলে পালিয়ে যেত। সংঘাত ও সংঘর্ষে বিজয়ীরা পরাজিতদেরকে হয় হত্যা নয়তো দাসত্বের শর্তে বাঁচার সুযোগ দিয়েছে।

দাসেদেরকে বাধ্য করা হয়েছে সকলের জন্য খাদ্য ও অপরাপর দ্রবাদ্রি সংগ্রহ ও শিকার করতে। দাসেরা পরিণত হল প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধের ভিত্তিতেই দাসপ্রভুরা নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বীয় বসবাসের এলাকাকে নিজ নিজ এলাকা হিসাবে গণ্য করল। অর্থাৎ, এভাবে এবং এই প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তা দেখা দিল মানব প্রজাতিরূপ পশুদের মধ্যে, যা এখনো অপরাপর পশুদের মধ্যে নাই।

একদা যারা ছিল মুক্ত ও স্বাধীন তাদেরকে গায়ের জোরে দাস বানালেই যে তারা দাসত্বের জীবন মেনে নিবে এবং দাস মালিকদের হিংসাত্মক ইচ্ছাধীন জীবন যাপন করবে তেমনতো হতে পারে না। অতঃপর, দাসদেরকে দমন-পীড়ন করা সমেত বিজয়ীদের বিজয় বা প্রভুত্ব বহাল ও বজায় রাখতে আবশ্যকতা দেখা দেয় দমন-পীড়ন কারী তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের। তাইতো বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে শক্তিমান, চালাক, চতুর কাউকে নিজেদের প্রধান হিসাবে মান্য করা সহ দাসদের মালিকানা বংশ পরম্পরায় বজায় রাখার জন্য উত্তরাধিকার সমেত উত্তরাধিকারের অধিকার সংরক্ষা ও শাসন-দমনে হিংস্র ও নিষ্ঠুর হওয়ার মতো যোগ্য কাউকে রাজা বা বাদশা নাম দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রবর্তন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। মানুষ মানুষে ভাগ-বিভাজন করে এক শ্রেণীর মানুষের শ্রমে অপর শ্রেণীর মানুষের পরজীবিতার আয়েশী জীবন-যাপনের জন্য মিশরেই প্রথম দাসতান্ত্রিক সমাজ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরে দাসতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকারীরাই ফারাও ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাকারী।

দাসদের মালিক তথা প্রভুদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও শাসনের দাসতন্ত্রে মানুষকে কেবল শ্রেণীর ভিত্তিতেই বিভাগ ও বিভাজন করা হয়নি বরং মানুষের একাংশকে নারী আরেকাংশকে পুরুষ আর কতিপয়কে হিজড়া হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করে মানুষে মানুষে বিভাজন-বৈষম্য ও বৈরীতা সৃষ্টি করতে দেহের অংগ বিশেষকে লিংগ বলে চিহ্নিত করে তারই ভিত্তিতে অর্থাৎ লিংগের ভিত্তিতে মানুষের পরিচয় চিহ্নত ও নির্ণিত করে রমন, ভোগ-সম্ভোগ, ও কামের কামিনি হিসাবে গণ্য করে যে অংশকে নারী বলে পরিচিতি দিয়ে পুরুষ নামীয় বর্বর-ক্ষমতাধর অংশকে মানবজাতির শক্তিমান অংশ বলে গণ্য করে নারীকে পুরুষের শাসনাধীনে স্বামির সম্পত্তিরূপে গণ্য করে নারীকে দুর্বল-অবলা, তবে স্বামির ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় বৈধ উত্তরাধিকার জন্ম দেওয়ার মেশিন রূপ অসভ্য বোধের রাজনীতি দ্বারা আচ্ছন্ন করে পুরুষকেই সমাজ শাসনের যোগ্য ও উপযুক্ত গণ্যে শাসক তথা পীড়নকারী-দমনকারীর উপযুক্ততা দিয়ে কার্যত নারী

হিসাবে চিহ্নিতদেরকে অন্দরমহলের বাসিন্ধা রূপ "মহিলা" বলে সনাক্ত করেছে। যদিও,দাসতন্ত্রে, দাস নামীয় পুরুষ নয় বরং দাস মালিকরাই ছিল সমাজের শাসকশ্রেণী।তাইতো, মিশরের ক্লিউপ্লেটা সহ বিভিন্ন দেশে দাসতন্ত্রেই নানান নারীকে শাসকতো বটেই, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রধান নির্বাহী বা নির্বাহী তথা শাসক হিসাবে দাস প্রভুরাই মেনে নিয়েছে বা দায়িত্ব দিয়েছে।

দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সমেত তৎকালীন শাসকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস ইত্যাদিকে গ্রাহ্যতা ও ন্যায্যতা দিতে দাস প্রভুদের তৈরী করতে হয়েছে নানান বানোয়াটি কল্প-কাহিনী, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, প্রথা ইত্যাদি। এই সবই কার্যত, দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য সৃজিত রাজনীতি। কিন্তু, এই সব নিয়ম-কানুন সহ তৎকালীন রাজনীতির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠাকারীরা কেউ কেউ তাদের রাজনীতিকে অভিহিত করেছে ধর্ম হিসাবে।

দাসতন্ত্রের রাজনীতি সৃজন ও প্রচারের জন্য যে গোষ্ঠী বিশেষের উপযোগীতা দেখা দেয় তারাই হচ্ছেন গুরু। গুরজীরাই বলেছেন যে, রাজা-বাদশা বিশেষ হচ্ছে ডিভাইন রাইট হোল্ডার। কাজেই, দাসদেরকে মানতেই হবে যে তাদেরকে শাসন-দমন,পীড়ন বা রক্ষা করার জন্যই ডিভাইন রাইট হোল্ডার রাজা-বাদশারা ক্রিয়াশীল অর্থাৎ রাজা-বাদশারা ডিভাইন রাইট হোল্ডার বলে দাসদেরও দন্ড-মুন্ডের কর্তা ও কর্তৃত্ব বটে। উল্লেখ্য, <u>দমনে রাষ্ট্র আর অবদমনে রাজনীতি কার্যকর অস্ত্র বটে।</u>

দাসতন্ত্রের রাজনীতি রচনা, প্রবর্তন ও প্রচারের আবশ্যকতায় দাসতন্ত্রের প্রভুগোত্রীয়রাই জন্ম দিল , গুরু/ ব্রাহ্মণ /পুরোহীত বা সাঁই বাবা বা শিক্ষক তথা জাতির শিক্ষক রূপী মহা জ্ঞানী বলে চিহ্নিত ও গণ্য হয়েছে তাদেরই সৃজিত নিদানে। দাসতন্ত্রের কোনো কোনো রাজ্যে উল্লেখিত গুরুকুলকে খোদ রাজ-রাজাদের অপেক্ষা বেশী মর্যাদাশীল বলে গণ্য করে গুরুদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের অজুহাতে উৎপাদনী কাজে দেশ বিশেষে নিষিদ্ধ করে গুরুদের ভরণ-পোষণের দায় ও দায়িত্ব প্রভুকুল নিয়ে থাকলেও কার্যত সকল গুরুজী

সমেত সকল দাস প্রভুদের জীবিকার সংস্থান করতে হয়েছে বটে দাসদেরই। অতঃপর, জন্মসূত্রে গুরুজীরা পরজীবী। কিন্তু,মজুর? অবশ্যই, কেবল স্বশ্রমজীবী–ই নয় বরং পুঁজিতন্ত্রের সকলের সকল ধরণের সকল পণ্য উৎপন্নকারী। অথচ, কেবলই শোষক পুঁজিপতিরা ছাড়া এসব পণ্যের বেশীরভাগই ভোগ–ব্যবহার করতে অযোগ্য ও অক্ষম বটে পণ্য উৎপন্নকারী খোদ মজুরেরা। ট্রেজেডি নয়?

শোষকদের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও শাসন বজায় ও বহাল রেখে পরজীবিতাকে স্থায়ীকরণে গুরুজীরাই গুরুবাণী তথা নানান মতবাদের পত্তন করেছিল। দৃশ্যমান বিষয়গুলোর সত্যাসত্য বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েও সেসব বিষয়াদিকে বিবেচনায় নিয়ে শোষকদের রাজনৈতিক স্বার্থে বানোয়াটি মূলে রচিত সেই সব মতবাদে গুরুরা নিশ্চিত করেছিলেন যে দাসেরা যেমন চিরকাল দাস থাকবে, তেমন দাসদের প্রভু –দাসতন্ত্রের শাসক শ্রেণীও টিকে থাকবে চিরকাল। এও তারা বলেন যে, এদেরই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা রাজা–বাদশারা ডিভাইন রাইট হোল্ডার বলেই থাকবে বটে চিরকাল। তাই, প্রকৃতি নির্ভর, স্থানীয় তবে খুবই দরিদ্র অর্থনীতির দাসতন্ত্রই থাকবে চিরকাল।

যতোই, দাসতন্ত্রের পন্ডিতকুল বলুক বা জাহির করুক যে দাসতন্ত্রই এক চির স্থায়ী ব্যবস্থা কিন্তু, কার্যত, দাসতন্ত্রতো নয়–ই বরং সামন্ততন্ত্রও যদি এখনো টিকে থাকত তবে, সামন্ততন্ত্র হতে উত্থিত হালের পুঁজিতন্ত্রের প্রবর্তন হত না। কিন্তু, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সমাজ রূপান্তর ও পরিবর্তনের নিয়মেই দাস ও সামন্ততন্ত্র বিলীন হয়েছে। মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রও এখন এক অচল ও অকার্যকরী ব্যবস্থাই নয় বরং সমাজের কাম্য উন্নয়ন কেবল ব্যর্থই নয় বরং প্রতিবন্ধক। ফলে, ইতিহাসের নিয়মেই ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক, তাই শ্রেণী বিভক্ত অতঃপর, বৈষম্য–বৈরীতায় ভরপুর, তীব্র প্রতিযোগীতার যুদ্ধ–বিগ্রহ প্রবণ এক অনিশ্চয়তার নিশ্চিত সমাজ–পুঁজিতন্ত্রও থাকছে না।

ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক দাসতন্ত্রের মতোই ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ – সামন্ততন্ত্রও দাসতন্ত্রের অনুরূপ রাজনৈতিক বোধের দ্বারাই

লজ্জাস্করভাবে মানুষকে কেবল অর্থনৈতিকভাবেই শ্রেণী বিভাজন করেনি বরং লিংগের ভিত্তিতেও সৃষ্ট বিভাজন-বৈষম্যকে সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রও ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজ হলেও এটি কার্যত পণ্য উৎপাদনী ও বেচা-কেনার তথা মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থা। তাই, শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে অধিকতর পুঁজি হাসিলের লোভে গুরুবাদের তথা বর্বর দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক বোধ, প্রথা ও নিয়ম-নীতির শিকলে গৃহবন্দী তথা মহলের বাসিন্ধা-মহিলাদেরকেও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে নারী পরিচিতদেরকে আগেকোর শোষকদের মতই "দুর্বল" আখ্যা দিয়ে পুরুষের তুলনায় কম মজুরি প্রদান করে অধিকতর শোষণের সুযোগ নিয়ে অধিকতর পুঁজি গঠনে আধুনিক শিল্পের মজুরে পরিণত করে।

উল্লেখ্য, মানুষের লিংগ ভিত্তিক পরিচিতি দ্বারা নারী ও পুরুষ বলতে যা বুঝানো হয়েছে এবং সেই বোধ দ্বারা লিংগের জাতকদের যে রূপ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং কার্যাদি নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা যে কেবল ভুল-অসত্য ও বানোয়াটি এবং বদমতলবজাত রাজনৈতিক বোধ বৈ ভিন্ন কিছু নয় বা প্রকৃত বিষয় নয় তাতো পুঁজিতন্ত্রেও বিভিন্নভাবে প্রমাণিত ও নিশ্চিত হচ্ছে। তাতে, এটাও নিশ্চিত হচ্ছে যে, মানুষের লিংগ ভিত্তিক বিভাজন, বৈষম্য বা বৈরীতা যে কেবল দাসতান্ত্রিক রাজনৈতিক বোধ বৈ বিজ্ঞান সম্মত নয়। অতঃপর,মানুষের লিংগ ভিত্তিক বিভাজন, বৈষম্য ও বৈরীতাও স্বাভাবিক নয় বরং কৃত্রিম তাওতো নিশ্চিত হয়েছে পুঁজিতন্ত্রে।

পণ্য উৎপন্ন করা একক কোনো ব্যক্তির কাজ নয়। পণ্যের নানান অংশ তৈরী করে বটে নানান জন। অতঃপর, পণ্য উৎপন্নে কোনো মতাদর্শ বা মতবাদ বা মিথোলজী নয় বরং পণ্য উৎপাদনে বাস্তব তথা বৈজ্ঞানিক ধারণা আবশ্যক। তাই, গুরুজীদের ভাবনা বা গুরুবাদ নয় বরং মজুরের কাজের শর্ত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনে মজুরকে জানতে হয় তার পণ্য উৎপাদনী কাজের ধরণ, প্রক্রিয়া ও পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা মেশিনারীজের ব্যবহার ও এসবের ক্রিয়া-কলাপ। এমন কি, জ্বালানি বা বিদ্যুৎ এর ব্যবহারও

জানতে ও বুঝতে হয় সংশ্লিষ্ট মজুরদেরকে। পরিবহন ও বিপন্ন প্রক্রিয়ায় জড়িত মজুরেরাও জানে বটে এদ্বিষয়ক তথ্য-ধারণা অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন ও বিপননে আবশ্যকীয় ধারণা জানতেই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মজুরকে।এই রূপ জানা-বুঝার কাজ যে খুব কঠিন তাহাও নয়।তাইতো, মজুরকে তার কাজে স্থায়ীকরণের শর্ত হচ্ছে সাধারণত ৯০দিন।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার কেহই সবজান্তা নয় আবার কেহই কোনো না কোনো বিষয়ে অজ্ঞ নয় তাহাও নয়। তাই, সকলেই কম-বেশ, কোনো না কোনো বিষয়ে অজ্ঞ আবার প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে কিছু না কিছু জানে। প্রকৃতপক্ষে বা সামগ্রীক ভাবে ও সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলে কেউ নাই। সুতরাং, অজ্ঞ বলে কেহ নাই। হতে পারে কোনো কোনো মজুরের প্রাতিষ্ঠানিক সনদ নাই বা নানান ভাষার পুঁথি পাঠের বা কারো কারো হয়তো কোনো বই পড়ার যোগ্যতাও হয়তো নাই। কিন্তু, সেওতো পণ্য উৎপন্ন করে। তাই, কিতাবী পন্ডিত না হলেও বা কিতাব পড়ুয়া না হলেও যে কোনো মজুর পণ্য উৎপাদনে তার কাজে কেবল যোগ্য ও উপযুক্ত নয় বরং দক্ষও বটে। শিল্প শৃংখলা বুঝে না, এমন মজুর যেমন নাই, তেমন সময়ানুবর্তিতা বুঝে না তেমন মজুরও শিল্পে পাওয়া যাবে না। উপরন্ত, পণ্য উৎপাদনে মজুরদের একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা নয় বরং পণ্য উৎপাদনী ক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা মেশিনারীজের নানান অংগ-অংশের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণতার মতোই পণ্য উৎপন্নে মজুরদেরও একে অপরের সহযোগী ও পারস্পারিক সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক যে আবশ্যক, তাও জানে-বুঝে বটে মজুর।

তবু, শ্রম-ঘন শিল্পের মজুরদেরকে বা কেতাব পড়তে না পারা মজুরদেরকে অজ্ঞ বলে কেবল নিন্দিত করাই নয় বরং এই ধরণের বা পশ্চাৎপদ প্রযুক্তির কারখানার মজুর বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জোত-জমির অনাধুনিক বা প্রায় আধুনিক কৃষির সাথে জড়িত মজুরদের অজ্ঞ-মূর্খ বলে গালাগাল করতে কার্পণ্য করে না শোষক-পরজীবী শ্রেণী। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মিডিয়ার উঁচা মজুরীর সাংবাদিক বা বিশ্ব

বিদ্যালয় সহ নানান প্রতিষ্ঠানে মোটা বেতনের অনেক অনেক ডিগ্রি ধারী বা তাবৎ তাবৎ তকমাধারী বা পদ-পদবী ধারী চাকুরীজীবি বা প্রকৌশলী বা চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ হয়তো এক কাপ চা বানাতে পারে না বা পারে না একটা গাড়ী চালাতে তাই বলে তাদেরেকে কেউ অজ্ঞ-মূর্খ বলে ভূষিত করে না বরং তাদের কেউ কেউ নিজেদের নামের আগে-পরে এখনো দাসতান্ত্রিক রাজনীতির তথা মানুষ মানুষে বিভেদ, বৈরীতা-বৈষম্য ও লজ্জস্কর বিভাজনের ঘৃণ্য বোধের পরিচায়ক বংশ-মর্যদা বা আভিজাত্যের বা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের মতো অসভ্যতা ও নীচুতার হীন বোধের জাত-পাতের বিভাজনের পারিবারিক পদ-পদবী যেমন ঠেসে দেয় তেমন নিজ নিজ সনদাদির পরিচিতি সহ পেশার সনদকে নামের অংশে পরিণত করেই ক্ষান্ত রহে না বরং অন্যান্যদেরকে খাটো করার হীন ও সংকীর্ণ চিন্তায় নিজেই নিজের মান বা আভিজাত্যের বা পান্ডিত্যের বহর ও বাহাদূরী দেখানোর নিমিত্তে স্বয়ং শিরোপীত শিরোপা তথা পন্ডিত, শিক্ষাবিদ, সব্যচাসী, পয়েট লর্ড, অমুক-তমুক বিশেষজ্ঞ, সুশীল বুদ্ধিজীবী সমেত নানান তকমায় সজ্জিত করে বা নানান বিষয়ে বিশারদ বা সাবেক পেশা বা অবলুপ্ত পেশাদির ঠিকুজি সমেত বাড়ীর দরজায় নাম-পলকও সাঁটে।

হতে পারে, শ্রম-ঘন শিল্পের বা পরিবহনের বা অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত মজুর বিশেষ হয়তো পড়তে পারেনি বা পড়ার সুযোগই পায়নি রাজনীতি, রাষ্ট্র, আইন ইত্যকার কিতাবদি বা কার্ল মার্কসের পুঁজি বা মার্কস-এ্যাংগেলসের রচিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা শোষকদের মৃত্যু পরোয়ানা রূপ কমিউনিস্ট পাটির ইস্তেহার; তাই বলে পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় বা পণ্য বিপনন বা পুঁজি গঠন ও সঞ্চালনে যে কাজ সে করে তার সেই কাজ সে করতে জানে না তাতো নয় বরং সেও জানে-বুঝে বটে মজুরি ও মজুরি দাসত্বের দুর্ভোগের কষ্টকর ও যন্ত্রণাময় জীবন। তবু, এই ধরণের মজুরকে গায়ে খাটা মজুর বলে বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ, ইত্যকার নানান দুর্নামে চিহ্নিত ও গণ্য করে এদেরকে আলোকিত- শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিতে লেনিনীয় তত্ত্ববিদরা সহ কথিত

বুদ্ধিজীবী নামীয় সর্ব বিদ্যায় বিশারদ কার্যত শ্রমে যে বুদ্ধি যুক্ত সেই বিষয়ে তথা শ্রম বিষয়েও অজ্ঞতার ধারণার বাহক বা জানলেও সত্য গোপনকারী তবে, চতুর-ধূর্ত বা ক্ষেত্র বিশেষ পুঁজিওয়ালাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের ভুয়া ও বানোয়াটি মতামত হলেও কার্যত সেই মজুরেরাও তাদের কাজ তথা পণ্য উৎপন্ন বিষয়ে স্বয়ং সচেতন এবং তাদের কাজ তারা করে বলেই পণ্য উৎপন্ন হয়।

মজুরের শ্রমে পণ্য উৎপন্ন হয়।তাই, মজুরের শ্রমেই পণ্যের মূল্য উৎপন্ন তথা পণ্যের বিনিময় মূল্যও হয়। আর মজুরের শ্রমে পণ্য মূল্য অর্থাৎ পণ্যের বিনিময় মূল্য উৎপন্ন হয়ে বলেই মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন হয়। কাজেই, মজুরেরাই উৎপন্ন করে পুঁজি। অতঃপর, মজুররা যদি কথিত পন্ডিতকুল বা ভদ্রজনদের ভাষ্যে অজ্ঞ, মূর্খ হয় তবে কোন নিস্কর্মার দল পণ্য বা পুঁজি উৎপন্ন করে? মূলত, মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণীই হচ্ছে কার্যত নিস্কর্মার দল -যে শ্রেণীর প্রত্যেকেই কেবল পরজীবীই নয় বরং দাস বটে পুঁজির। অথচ, মজুরী দাস হয়েও মজুরেরা কিন্তু দাস নয়। কর্ম দিবসে চুক্তিকৃত সময়ে চুক্তিকৃত সুনির্দিষ্ট কাজ করার পর মজুর আর দিনের অবশিষ্ট সময় বা বন্ধের দিনে তার শ্রম-শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতির অধীন নয় কোনো শ্রমিক বরং ঐ সময়ের সুযোগ মজুর তার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, মজুরদের এই রূপ সুযোগ বিনা মজুরিতে কাজে লাগাতে পুঁজিপতিরাই তাদের বিকাশে প্রতিবন্ধক সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধে মজুরদেরকে টেনে এনে রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠন বা দল বিষয়েও জানা-বুঝার সুযোগ করে দিয়েছে বটে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী।

এমনকি, পুঁজিতন্ত্রের উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা পত্তনের পর শাসক তথা রাষ্ট্রের নির্বাহী নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকার সহ বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের আইনী স্বাধীনতার অর্থাৎ শাসকদের তৈরী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন

করে প্রত্যেকের ভোটকে সমগুরুত্বপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রচারণা দ্বারা কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীও মানুষে মানুষে যে সমান তা স্বীকার করে নেয়। যদিচ, ব্যবহারিকভাবে হচ্ছে বটে উল্টোটাই। কারণ কিন্তু সেই ব্যক্তিমালিকানাজাতও বৈষম্য-বৈরীতা ও বিরোধ। পুঁজিতন্ত্র একটি শ্রেণী বিভক্ত সামাজ হওয়া সত্ত্বেও মূলত শ্রেণীকে গোপন করে বুর্জোয়া শ্রেণীর কথিত গণতান্ত্রিক তথা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার রাজনীতিও কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানার কারণেই স্ববিরোধীতাপূর্ণ এবং মিথ্যাচার ও ভন্ডামির গাল-গল্পে ভরপুর। আসলে, রাজনীতি শুরুই হয়েছিল দাস প্রভু তথা শোষক-পরজীবি শ্রেণীর স্বার্থে বলেই জন্মশর্তেই রাজনীতি হচ্ছে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অসত্য ও মিথ্যাচারে ভরা।

বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে পত্তনকৃত প্রতিনিধিত্বশীল সরকার বা ভোটাভোটির গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তির ক্রেতা- পুঁজিপতি বিশেষের রাজনৈতিক চিন্তার বিপরীতে মজুরেরা অবস্থান নেওয়ার সুযোগ সীমিত পরিসরে হলে পত্তন করে বটে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী। ফলে, কেবল বেচা-কেনায়ই নয় বা মজুরি নির্ধারণে দরাদরি করারই নয় বরং শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর মতামত, মতাদর্শ, রাজনীতি, আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে মতামত গঠন ও প্রকাশের সুযোগও কবুল করতে হয়েছে বটে বুর্জোয়া শ্রেণীকে; স্বীকার করে নিয়েছে বটে মজুরদেরও সংগঠন এবং সভা- সমাবেশ করার অধিকার। যদিও অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের ফসল- ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার তার যাত্রা শুরুর নির্দেশিকায়ই মজুরদের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল বুর্জোয়াদের স্বার্থে।

উল্লেখিত ব্যবস্থাদির কারণেও মজুরেরা জানা-বুঝার সুযোগ পায় যে, মজুরেরা মানুষ হিসাবে অপরাপর শ্রেণীর মানুষদেরই মতোই মানুষ এবং দাস নয় তারা দাসতান্ত্রিক সমাজের বরং মজুরেরা মজুরি দাস। আর পুঁজিপতি শ্রেণী কিন্তু সর্বাস্থায় পুঁজির দাসত্ব করতে হয়। সুতরাং,

মজুরেরা মজুরি কালীন সময়ে মজুরির বিনিময়ে দাস। কিন্তু, পুঁজির গোলাম –পুঁজিপতি শ্রেণী?

একথা সত্যি যে, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থার উপযোগী মানব শক্তি তথা দক্ষ মজুর সহ প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপক–পরিচালক বা সমাজের শাসক শ্রেণীর নানান ধরণের সেবক–রাজনীতিক উৎপন্ন করতে পুঁজিপতি শ্রেণীই সূচনা করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার। এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি আধুনিক শিল্পও বটে। তাই, এই শিল্পের শিক্ষণ–প্রশিক্ষণ ও অপরাপর কাজে যুক্ত পেশাজীবীরাও মজুর বৈ ভিন্ন কিছু নয়। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথিত " শিক্ষাবিদ" অধ্যাপকগণও মজুর বটে।

উল্লেখ্য, যে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য আছে কিন্তু বিনিময় মূল্য নাই তা কেবলই দ্রব্য। কিন্তু, যে দ্রব্যের ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য আছে সেই দ্রব্য হচ্ছে পণ্য। তাই, সকল পণ্য দ্রব্য হলেও সকল দ্রব্য কিন্তু পণ্য নয়। আবার পুঁজি যেহেতু পণ্যের অপরিশোধিত অংশ তাই, পণ্য উৎপন্নকারী মজুরই উৎপন্ন করে পুঁজি। অতঃপর, কারো শ্রম–শক্তি যদি পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে বিক্রি হয় তবে সেই শ্রম–শক্তি হচ্ছে তার পণ্য। সুতরাং, শোষক পুঁজিপতিরা নয় বরং শ্রম–শক্তি বিক্রেতা মজুর বা মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্বকারী তা তিনি যতো মোটা অংকের মজুরীই পান না কেন সেই সকল শ্রম–শক্তি বিক্রেতা মজুরেরা পণ্য উৎপাদন করে পুঁজি গঠন করে । তবে, বেশী মজুরির মজুরেরা সাধারণত নিজেদেরকে ' অভিজাত' বা কথিত "বুদ্ধিজীবী" ভাবতে পছন্দ করে।তাদের কেউ কেউ ব্যবসায়ী–শিল্পপতি হওয়ারও চেষ্টা–অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় বলে এদের এরূপ চিন্তা ও ক্রিয়াদি প্রকৃতপক্ষে ও সামগ্রীকভাবে মজুর শ্রেণীর বিপক্ষে যায়। এটাও মজুর শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের জন্য কেবল বাঁধাই নয় বরং ক্ষতিকরও বটে। তবে, এরাই যাদেরকে গায়ে খাটা বা অজ্ঞ মজুর বলে সেই কথিত গায়ে খাটা বা অজ্ঞ মজুরদের জংগী (মিলিটেন্ট) আন্দোলনের সফলতার সুযোগ–সুবিধা কিন্তু আন্দোলন না করেও ভোগ করে বটে এই সব কথিত অভিজাত মজুরেরাও।

শ্রম-শক্তির ক্রিয়া বা ব্যবহার হচ্ছে শ্রম। স্নায়ু, পেশী, অস্থি ও মস্তিষ্কের ব্যবহার ছাড়া শ্রম সম্ভব নয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া হচ্ছে চিন্তা। তাই, মজুর মাত্রই চিন্তক না হওয়ার কোনো কারণ নাই। আবার শ্রম সমতাবাদী বলেই একটি পণ্যের সমমূল্যেও অপর পণ্যের বিনিময় হয়। পণ্যের দাম হচেছ পণ্যে নিষিক্ত শ্রমের দাম। শ্রম-শক্তিও একটি পণ্য যা বিক্রি করে মজুর। মজুরী নির্ধারিত হয় শ্রম-শক্তি উৎপাদনের খরচ অনুযায়ী। মজুরীতে তফাত হওয়ার কারণটাও তাই।মজুরির তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও মজুরের স্বার্থ যেমন এক ও অভিন্ন তেমন পণ্য উৎপাদনে প্রত্যেকে মজুরই কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং একই পণ্য উৎপন্নকারী সকল মজুর অন্যোন্য-নির্ভরতার সম্পর্কাধীন।এই রকম নির্ভরতার সম্পর্কের কারণেই মজুরেরা একে-অপরের সহযোগী-বন্ধু আর, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক বলেই পুঁজিপতি শ্রেণীর সকলেই একে অপরের প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বি,এবং শত্রুও বটে।

পণ্য উৎপদন যেমন একক নয় বরং সামাজিক তেমন পণ্য বিক্রির জন্যই পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাটাও একটা বৈশ্বিক ব্যবস্থায় পরিণত করতে বাধ্য হয়েছে বটে পণ্যের তথা পুঁজির মালিক পুঁজিপতি শ্রেণী, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে। তাই, পণ্যের বাজারও বৈশ্বিক। সুতরাং, দেশীয় বা জাতীয় অর্থনীতি বলে যেমন বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রে কিছু নাই, তেমন শ্রম-শোষণের ফল তথা অপরিশোধিত শ্রম- পুঁজিও দেশীয় বা জাতীয় নয় বা আমালা-মুৎসুদ্দি নয় বা লুটেরা বা দালাল পুঁজি নয়।

পুঁজি হচ্ছে পুঁজি যা উৎপন্ন করে মজুর। তাই, পণ্য উৎপন্নকারী মজুর শ্রেণীই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক শোষিত। আর, পুঁজিপতি শ্রেণীর সকল পুঁজির স্রষ্ট্রাও বটে কেবলমাত্র মজুর শ্রেণী। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির মালিকানার শর্তেই, শোষক, পরজীবী, অন্যায়কারী, অন্যায্য মালিকানার অধিকারী, লোভী, মিথ্যাচার, খুন, ধর্ষণ, লুট-পাট, জাল-জালিয়াতি, অনিয়ম, দুর্নীতি ইত্যকার হরেক রকমের প্রবণতা সহ যুদ্ধ প্রবণতার বদস্বভাবজাত সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতার হিংস্র এবং হালে মন্দা তথা অতিরিক্ত মজুতের ভারে ও চাপে পুঁজি হারানোর ভয় ও আতংকে ভীতি. আতংকিত ও সন্ত্রস্ততায় বা নৈরাজ্যে, উন্মাদন

ও উন্মত্তায় আক্রান্ত এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল উন্মত্ত শ্রেণী। যদিও, লুট-পাট, চুরি-ডাকাতি বা ছিনতাই-চাঁদাবাজি,ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাকার বিষয়াদি বুর্জোয়া আইনেও অপরাধ এবং এসবে লাভ-ক্ষতি যা হবার তা হচ্ছে পুঁজিপতিদেরই। উল্লেখ্য,ব্যক্তিমালিকানা পত্তনের কাল হতেই জবর-দখল, লুট-পাট, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, খুনাখুনি ইত্যকার দুস্কর্মাদি সংঘটিত হয়ে আসছে। অতঃপর, যতোদিন ব্যক্তিমালিকানা থাকছে ততোদিন ব্যক্তিমালিকানার বাই-প্রোডাক্ট বা অনুসংগ এই সব খারাপ বিষয়াদি কম-বেশ থাকবেই।

পুঁজিপতিদের রাজনীতিকরা এইসব নিয়ে নিত্যই কাজিয়ায় লিপ্ত হয় বটে যদিও তারা কেহই এসব বিনাশে আগ্রহী নয় কারণ তারা কেহই ব্যক্তিমালিকানার বিলোপে ক্রিয়াশীল নয় বরং ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তি মালিকানা রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের প্রবর্তন করেছে লেনিন-মাও, কিম-ফিদেল প্রমুখ কমিউনিস্ট নাম ধারী কার্যত,পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের চালাক-চতুর সেবক ও গোলামেরা।

লেনিনবাদী মোড়লেরা সহ তাবৎ রাজনীতিক ও গুরুকুল বলে বেড়ায় যে তারা হচ্ছেন জাতি সেবক, জনসেবক, জনদরদী ও জনতার মুক্তির প্রেরণাদাতা, ত্রাতা ও নেতা। কি ভয়ানক অসত্য ভাষণ বা গুরুবাক্য বটে। তবে, শোষকদের এবং পুঁজিতন্ত্রে শোষক পুঁজিপতিদের জন্য আবশ্যকীয়। কারণ, এইসব গুরুবাক্য ও বচনের মাধ্যমে ওরা যে ধারণার প্রসার ও প্রচার করে তাতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজকে যেমন আড়াল ও গোপন করা যায় তেমন শোষকদের শোষণমূলক ভূমিকাকে ধামা-ছাপা দিয়ে বৈষম্য-বৈরীতার শ্রেণী বিভাজনের সমাজের শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার বিরোধ-বিবাদ তথা শ্রেণী সংগ্রামমকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে শোষিত ও শাসিত শ্রেণীকেও তার শ্রেণী পরিচয় অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে তাদেরই শোষক-শাসকদেরকে একই কাতারভুক্ত তথা জাতি, জনতা বা কথিত জনগণের অন্তর্ভুক্ত করে শোষিতদের শ্রেণী স্বার্থকে বেমালুম ভুলিয়ে দেওয়ার এক বটিকা বিশেষ।এই ভন্ড ও মিথ্যাচারী গুরুকুলের কাজ বা পেশা হচ্ছে শোষিত ও শাসিতদেরকে শাসন ও

শোষণে বিষয়ে বা হালের পুঁজি বিষয়ে মিথ্যাচার ও বিভ্রান্ত করে এমনকি জীবন ও জগত বিষয়েও নানান ভুয়া অথচ ক্ষতিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন ও ভুয়া প্রাপ্তির মোহাচ্ছন্ন করে মজুরদেরকে শ্রেণী মুক্তির শ্রেণী সংগ্রাম হতে দূরে রেখে বা নানান মতবাদে দুনিয়ার মজুরদেরকে ভাগ-বিভাগ ও বিভাজন করে শোষক ও শাসক শ্রেণীকে সেবা করা। অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক ব্যক্তিগত মালিকানার হেতুবাদেই মজুরের তাবৎ দুর্ভোগ ও দুর্দশায় জীবনপাত করে। এমন কি, পুঁজির মালিক পুঁজিপতিরা কেবল খারাপ অবস্থাই নিপতিত নয় বরং পুঁজি হারোনোর ভয়ে ও আতংকে দিন কাটায় এবং পুনঃপুন মন্দায় ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপ্তীও দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে । কার্যত, ব্যক্তি মালিকানার পুঁজিতন্ত্রই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ব্যক্তিমালিকানাকে সংকোচিত করে সামাজিক মালিকানার যাবতীয় ভিত ও শর্ত তৈরী করছে। অথচ, সেই ক্ষয়িষ্ণ ব্যক্তিমালিকানা হাসিলের মাধ্যমে জীবনের সাফল্য হিসাবে চিহ্নিত করে ব্যক্তিমালাকানা অর্জনের মাধ্যমে মুক্তি লাভের অলীক কল্পনা বা দিবা স্বপ্ন ফেরি করছে বটে লেনিনবাদী মোড়লেরা সহ আরো অনেক অনেক পুঁজির সেবকরা। পুঁজিতন্ত্রে, রাজনীতিক দলের নেতা-পাতি নেতা সমেত নানান জাতের গুরুকুল জীবন-যাপন করছে বটে মজুরের শ্রমে তাই,এরা সকলেই পরজীবী। তাছাড়াও আরো কত শত রকমের সেবক-রক্ষক ও পাহারাদার বা ব্যবস্থাপক বিশেষ সেবা করছে বটে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের। যদিও ডিফাংক্ট তবু রাষ্ট্র সংখ্যা কেবলই বাড়িয়ে প্রচুর রাষ্ট্রজীবী সমেত নানান বৈশ্বিক সংগঠন ও সংস্থার মোটা মাইনার পরজীবীও অগণন।

পুঁজিতন্ত্রের পূর্বে আর কোনো শ্রেণী বিভাজিত সমাজে এতো বেশী সংখ্যক পরজীবী ছিল না। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র একটি আধুনিক সমাজ হয়েও কেবলই শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীকে টিকিয়ে রেখে পুঁজিতন্ত্র অটুট রাখতে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই লেনিন-মাওদের মতো রাজনৈতিক তথা আধুনিক গুরুকুলই লালন-পালন করছে না বরং পরিপোষণ করছে বটে দাসতন্ত্রের রাজনীতির রাজনৈতিক

গুরুকুলকেও। এই নির্লজ্জ গুরুরা সকলেই বলে থাকে যে অমুক বা তমুক গুরুর শিক্ষা আকঁড়ে ধর দৃঢ়ভাবে, গুরু বা সাঁইজির আদর্শ ও আদর্শিক জীবনাচার অনুসরণ বা ভোগবাদ পরিহার করে গরিবী ও তথাকথিত সৎ জীবন যাপন কর তবেই মুক্তি হাসিল হবে। অথচ, শোষকদের সেবক পরজীবী হিসাবে এরা– এই গুরুজীরা বা কথিত শিক্ষককুল নিজেরাই আইনত কেবল অসৎ নয় বরং ব্যাপক ভোগ–বিলাসিতা সহ নানানজন নানান অনাচারী জীবন যাপনকারীও বটে। উপরন্ত, এরা এই অত্যাধিক প্রযুক্তির পুঁজিতান্ত্রিক যুগেও দাসতন্ত্রেও রাজনৈতিক বোধের কথিত সততা, নীতি–নৈতিকতা, তথা গুরুজীদের সৃজিত আদর্শ বা মতাদর্শ মতো বিবাহ বর্হিভূত মিলনকে ব্যাভিচার বা চরিত্রহীনতা আখ্যায়িতকরণ করে এসব হতে বিরত থাকা সহ অসতী নারীর সংগ পরিত্যাজ্য সমেত মেয়েদের কুমারিত্ব বা অক্ষত যোনির স্বপক্ষীয় থাকাকে সৎচরিত্রের রূপ সংজ্ঞায়িত জীবনাচার হিসাবে মান্য করানোর হুকুম–নির্দেশাদি উপযুক্ত দন্ড সহ কার্যকরণে নৈমত্তিক প্রয়াশ চালিয়েও কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদির কারণে নিত্যই ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কেবলই দাসোচিত চিন্তার রাজনীতিকেই নবীকরণ ও পুনবর্হাল করার অপচেষ্টা করছে। তবে, বিপুল পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার মধ্যেই দাসতান্ত্রিক সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে সাম্প্রতিক কালেও দুনিয়ার নানান স্থানে তাদের রাজত্বও প্রতিষ্ঠা করেও কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে কালের গর্ভে বিলীন হচ্ছে। অথচ, বিনাশিত ও বিলীন হওয়ার শংকায় বিপন্ন ও শংকিত চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সামগ্রীকভাবে দাসতান্ত্রিক রাজনীতির নিকট আশ্রয় নিয়েছে বলেই ঐ প্রতিক্রিয়াশীলদেরও কেউ কেউ দাসতান্ত্রিক রাজনীতির গুরুদের মধ্যেকার চরম উগ্রতা ও হিংস্রতায় নিমজ্জিত তথা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খুন করার মতো গুরুবাদ ও গুরুদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে কেলই মজুরদেরকে গুরুবাদে মোহাচ্ছন্ন, আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করতে।

যতোই, চেষ্টা ও অপচেষ্টা করুক না বটে ঐ সব ধরণের গুরুকল কিন্তু, পণ্য উৎপন্নে মজুর শ্রেণী যেমন কেবলই বেচা-কেনার নিয়মের অধীন তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীও। তাই, গুরুকুলের বাণী বিশেষ মেনে কথিত আদর্শ জীবন যাপনের সুযোগ কারোই নাই এই পুঁজিতন্ত্রে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান উৎপাদনী ব্যবস্থার নিয়ম বৈ অতিতের সমাজগুলোর নিয়ম-নীতি ও কথিত আদর্শবোধ হুবুহু মেনে চলার সুযোগ যদি পরিপূর্ণভাবেই থাকে পুঁজিতন্ত্রে তবে আর দাসতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রে তফাত হয় কেমনে। অথচ, এই দুই সমাজ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-দাসতন্ত্র এবং শেষ ও চূড়ান্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-পুঁজিতন্ত্রের মধ্যকার ফারাক হচ্ছে নিজস্ব আলোহীন গ্রহ আর আলোর উৎস নক্ষত্রের মতো। দাসতন্ত্র হতে জন্ম নিয়েছে বর্বর তথা আন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্য যুগীয় সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে জন্ম নিচ্ছে সমাজতন্ত্র- এক আলোকিত মানবিক সমাজ।

এটা ঠিক যে, দাসতন্ত্রও ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক ও শোষণমূলক এবং পুঁজিতন্ত্রও তাই; অতঃপর, ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত ও শোষণের স্বার্থে সৃজিত বহু নিয়ম-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পুঁজিতন্ত্রেও থাকাটা স্বাভাবিক। । কিন্তু, তাই বলে বেশুমার পণ্যের পুঁজিতন্ত্র আর প্রায় পণ্যহীন দাসতন্ত্রের মধ্যে তফাত থাকবে না এটাতো অস্বাভাবিক। দাসতন্ত্রে শাসক ছিল বটে রাজা-বাদশারা উত্তরাধিকার সূত্রে কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র ভোটাভোটির প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থার পত্তন করে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং ডিভাইন রাইট হোল্ডারদেরকে নির্বাসিত করার ইহলৌকিকতার নীতিও প্রবর্তন করেছিল বুর্জোয়ারাই।

উল্লেখিত, রাজ-বাদশাদের শাসন চিরস্থায়ীকরণে তখনকার গুরুকুলদের সৃজিত কথিত আদর্শ বা মতাদর্শ বা দর্শনমতো জীবন যাপনের চিন্তাতো দাসোচিত চিন্তা বৈ কিছুই নয়। কিন্তু, দাসতন্ত্রের দাসেরাও যে ঐ রকমভাবে দাসোচিত জীবন যাপন করতে চায়নি বলে স্ফার্টাকাস সহ দাসদের কেহ কেহ বিদ্রোহ করেছিল। আর পুঁজিতন্ত্রে পণ্য উৎপন্নকারীরাতো দাস নয় বরং মজুরি দাস। তাই, মজুরি দাসেরা

যেমন দাসোচিত চিন্তার কোনো গুরুর তামিল নেওয়ার দরকার নাই তেমন সকল প্রকার দাসোচিত চিন্তা তথা মতাদর্শ মুক্ত বৈজ্ঞানিক জীবনের ধারণাতো পণ্য উৎপাদনকারী প্রক্রিয়া হতেই পেয়ে থাকেন তারা । তবু, লেনিনবাদীরা তাদের মহা গুরু লেনিন বা লেনিনের নানান খলিফা তথা মাও, কিম প্রমূখ জাতীয় গুরুদের শিক্ষা ও আদর্শ মতো কথিত জীবনাচার করার ফতোয়াই দিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু, কার স্বার্থে? ওরা কি দাসোচিত চিন্তার ব্যক্তি নয়? একজন দাস বিদ্রোহ করতে পারলেও দাসোচিত চিন্তার ব্যক্তি তার প্রভু বা গুরু ছাড়া জীবন যাপনেও অযোগ্য ও অক্ষম। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র বিনাশের আন্দোলন করার যোগ্য বটে কেবল মাত্র এবং একমাত্র মজুর শ্রেণী নিজের মুক্তির শর্তেই সকল প্রকার দাসোচিত চিন্তা বা দাসতন্ত্র হতে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক ও শোষণমূলক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সকল ধরণের নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ বা মতাদর্শ, দর্শন, প্রথা-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমেত মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টিকারী সকল বিষাক্ত জঞ্জাল বিলীন করবে বটে মজুর শ্রেণী সমগ্র মানব জাতির মুক্তির শর্তে নিজের শ্রেণী মুক্তি তথা শ্রেণী বিলুপ্তির শর্তে।

শ্রেণী না থাকলে শ্রেণী শাসক থাকার সুযোগ নাই। আর শ্রেণী শাসক না থাকলে গুরুজী/সাঁইজি বা গাইড বা নেতা বা বীর এসব কোনো ধরণের পরজীবীর উপযোগিতাও শ্রেণী মুক্ত সমাজে নাই। ফলে, বিজ্ঞান বৈ আর কোনো মতাদর্শ বা রাজনীতি বা দর্শন সমাজতন্ত্রে থাকার সুযোগ থাকবে কেন? অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি- সমাজতন্ত্র হচ্ছে পরজীবিতা মুক্ত এক বৈজ্ঞানিক সমাজ।

জন্মসূত্রেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন-পীড়ন করার এক সংগঠিত শক্তি। আধুনিক রাষ্ট্রও তাই, অর্থাৎ রাষ্ট হচ্ছে শোষক ও শাসক শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী দমন-পীড়নমূলক যন্ত্র। তাই, রাজনীতি হচ্ছে দুনিয়ার তাবৎ দুস্কর্ম ও কুকর্মের পলিসিগুলোর মধ্যে সুপ্রীম পলিসি।অতঃপর, রাজনীতিকেরা বা গুরুজী/নেতাজীরা কে এবং কি? কিন্তু, দাস ও সামন্ততন্ত্রের রাজনীতিক ও গুরুজীদের মতোই পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতিকরা তথা

নেতারা এমনকি লেনিন ও মাওয়ের মতো গুরুজীরা বলেন যে রাজনীতি হচ্ছে সবচাইতে মহান কর্ম আর রাজনৈতিকরা হচ্ছে মহান। কি সর্বনাশ! যারা সেবা করে পুঁজিতন্ত্রী শোষক শ্রেণীর তাও আবার মজুরের উৎপন্নে দিনাতিপাত করে বলে পরজীবী সেই তারাই যদি হয় মহান তবে তাদেরই রাজনীতির বোধে মজুরেরা হয় বটে অর্ডিনারী। অবশ্য, মজুরদেরকে অর্ডিনারি হিসাবে চিহ্নিত না করলে মজুরদের মহান গুরু বা শিক্ষক বা নেতা বা পথ প্রদর্শক এই সব তকমা কি ভাবে গ্রহণ করবে বটে যুদ্ধবাজ-শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর চতুর সেবক লেনিন-মাও, ট্রটস্কি-স্তালিন, কিম-হোচিমিন, পলপট-ফিদেল, হোক্সা-টিটু, চসেস্কে -হোক্সরা? কিন্তু, উল্লেখিত নেতা বা গুরু বা পথ প্রদর্শকরা যে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার হেতুবাদেই মজুর শ্রেণীর নিকট অপাংতেয় তাতো উপরের বিবরণে নিশ্চিত হয়েছে।

পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরকে মজুরি দেয় বটে শ্রম-শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি। উল্লেখ্য, যদি খোদ রাষ্ট্র শিল্প-কারখানার মালিকানা গ্রহণ করে পণ্য উৎপন্নকরণে শ্রম শক্তি ক্রয় করে পুঁজি গঠন করে তবে এক্ষেত্রে খোদ রাষ্ট্রটিই ব্যক্তি পুঁজিপতির ভূমিকা পালন করে। তবে, ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র কেবল আরো বেশী ক্ষমতাধরই নয় বরং রাষ্ট্র নিজেই শোষকের সর্বাধিকশক্তিমান দমন-পীড়নের যন্ত্র বিধায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে রাষ্ট্র, কেবল মজুরদের উপর অধিকতর কঠিন-কঠোর ও কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে মজুরদের দমন-পীড়নই করে না বরঞ্চ একচ্ছত্রভাবে পণ্য বাজার তথা শ্রম বাজারও নিয়ন্ত্রণ করে বলে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রে মজুরেরা শ্রম-শক্তির বেচা-কোনায় মুলা-মুলি বা দরাদরি বা শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ে হস্তক্ষেপ করার অযোগ্য বিবেচিত হয়। ফলে,যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা জাপান-ফ্রান্সের মতো পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মজুর অপেক্ষা লেনিনবাদী তথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মজুরেরা অধিকতর বেশী পরিমাণে কেবল শোষিতই হয় না উপরন্ত হালের চীন, ভিয়েতনাম বা উত্তর কোরিয়ার

মজুরেরা যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্ত রাজ্য বা জাপানের মজুরদের চেয়ে অধিকতর মাত্রায় শোষণ, দমন-পীড়নের শিকার হয়।

মূল্য ছাড়াও মজুর যে উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি উপন্ন করে তা পুঁজিতন্ত্রী নিয়ম ও আইনে লাভ করে বটে পুঁজিপতি। তাই,পুঁজিপতি শ্রেণী তাদেরই রচিত আইন-বিধান মতো তথা আইন সম্মতভাবেই মজুরদেরকে শোষণ করে। তবে, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করা যতোই আইন সম্মত হোক না কেন কিন্তু, শোষণ করাটা যে অন্যায়, অন্যায্য, ও অযৌক্তিক বা অসভ্যতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, এবং হিংস্রতা তাতেতো কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই। অতঃপর, পুঁজিপতি তথা পুঁজির মালিক বা পুঁজির অংশ বিশেষ ভোগী তথা পুঁজিতন্ত্র রক্ষা ও সংরক্ষায় বা পুঁজিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত, জড়িত সকল প্রকারের পরজীবীরাই কিন্তু, মজুরের শোষক বলে তাবৎ পরজীবীকুল অন্যায়কারী, অবিচারিক, ও অযৌক্তিক আচরণকারী তথা দ্বি-চারী বলে তারা সকলেই কম-বেশ লোভ-লালসা, ব্যক্তিস্বার্থপরতা-সংকীর্ণতা, অসত্যতা, মিথ্যাচার, ভুয়ামি, জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা-বেঈমানী, বিশ্বাস ঘাতকতা- শত্রুতা, বৈরীতা-বৈষম্য, হিংস্রতা-নৃশংসতা, উন্মত্ততা-হঠকারিতা, যুদ্ধোন্মাদনা ও যুদ্ধপ্রবণতার জাতক ও রোগী।

মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করাটা যেমন অন্যায় তেমন মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করাটা কেবলমাত্র মানুষ কর্তৃক মানুষকে পরাধীন, বন্দী, দমন-পীড়ন, অত্যাচার, অনাচারই করা নয় বরং সবচাইতে অসভ্যতম, ঘৃন্যতম, বর্ববরতম এবং অমানবিক কাজ।

অনেক অনেক মজুরি দাসের সম্মিলিত মজুরি শ্রমে উপন্ন পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা যেমন কেবল অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিকই নয় বরং স্ববিরোধীপূর্ণ। আবার, প্রকৃতি যেমন কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয় তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ-জমি বা প্রকৃতি হতে সৃষ্ট তথা প্রকৃতিজাত কোনো মানুষও কোনো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। কিন্তু, দাস (মানুষ) ও ভূমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে পরস্পরের বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে দন্ডায়মান এক

পক্ষের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী আরেক পক্ষের গায়ের জোরে তবে,সম্পূর্ণ অন্যায় ও অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে।
তাইতো, বিজয়ীদের স্বপক্ষে ওদেরই চালুকৃত বাণী বিশেষ হচ্ছে– " বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা", অর্থাৎ
" সারভাইভাল আর দ্যা ফিটেস্ট"।
ব্যক্তিমালিকানার অন্যায় ব্যবস্থাকে গ্রহ্যতা, ন্যায্যতা দিয়ে তা বহাল রাখতেই রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রেরও প্রবর্তন করেছিল দাস মালিকেরাই। কিন্তু, এই অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক মালিকানা ক্রমাগত সীমিত ও সংকোচিত করছে বটে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাই কেবলই পুঁজি'র অস্তিত্ব রক্ষার শর্তাদি – (১) পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চালন আর পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্ত– পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরত বিপ্লবীকরণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অতি উৎপাদন এবং অতি উৎপাদনের ফলাফল– মন্দার কারণে। মন্দা, বিপন্ন ও বাঁধাগ্রস্ত করে পুঁজির সঞ্চালনকে। তাই, মন্দার হামলায় সংকটাপন্ন ও সমস্যাগ্রস্ত পুঁজিতন্ত্রে পুঁজি হারানো সহ পুঁজিপতি শ্রেণীর বিপন্ন সদস্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধের কারণও বটে মন্দা।
পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত –পুনরুৎপাদন ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্ত – উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরত বৈপ্লবীকরণের মাধ্যমে অতি উৎপাদন করে পুঁজির অস্তিত্বের অপর শর্ত– সঞ্চালনকে বিপন্ন ও সংকটাপন্ন করে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীই জন্ম দিয়ে থাকে মন্দার। তাই, মন্দা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের এক নিরাময় অযোগ্য ব্যধি যে ব্যধিতে পুনঃপুন আক্রান্ত পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় অযোগ্য ও অক্ষম। মন্দায়, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয় বটে মজুর শ্রেণীও। তবে, দুনিয়ার মজুরেরা একতাবদ্ধ হলে মন্দায় ভয়ানকভাবে বিপন্ন ও নানান ভাবে বিভাজিত , বিভক্ত ও বিবাদমান তাই, খুবই দুর্বল শ্রেণী – শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীকে ইতিহাসের যাদুঘরে পাঠানোটাই বিপ্লবী তবে দুনিয়াব্যাপী ব্যাপকভাবে সংগঠিত তাই, খুবই সবল–শক্তিশালী মজুর শ্রেণীর নিকট বিকল্পহীন করণীয় হিসাবে উপস্থিত হয়। স্বীয়

শ্রেণীর মুক্তির শর্তে মজুর শ্রেণী যেমন তার বিকল্পহীন করণীটা তথা একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত করতে তেমন বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে ইতেহাসের অংশ হওয়াটাই হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর ভবিতব্য। অতঃপর, পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা হীন, শোষক হীন, শাসন হীন অতঃপর, মুক্ত মানুষদের এক মুক্ত সমাজ।

পুঁজিপতি শ্রেণী তার বিকাশের কালে গুরু ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে, পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তিও ব্যক্তিমালিকানায় বিধায় নেতা-পাতি নেতা সমেত রাজনৈতিক দলের পত্তন ঘটায়। কিন্তু, কমিউনিস্ট ইস্তেহার প্রকাশিত হওয়ার আগেই (১৮৪৮) পুঁজিতন্ত্র যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয় তখন হতে নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই টিকে থাকতে নিজেদেরই পত্তনকৃত গণতন্ত্রে ও গণতন্ত্র চর্চায় সৃষ্ট রাজনৈতিক দল ও আধুনিক রাষ্ট্রকেও গুরুবাদের নিকট আশ্রিত করে নিজেরাই নানান তরফের গুরুর সেবা-যত্ন করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও মিডিয়াকে ব্যবহার করছে গুরুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে দাসতন্ত্রের গুরুদের মহিমা ও মাহত্মের পুনরুত্থান ঘটিয়ে একালের মজুরি দাসদের দাসতান্ত্রিক রাজনীতির আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন, মতিছন্ন ও বিভ্রান্ত করে অবদমন করতে বর্তমান নয় অতীতের নিকট আশ্রয় নিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের অতীতের গৌরবময় কীর্তি ও ভূমিকাকেও অস্বীকার ও অবজ্ঞা করছে। ধিকঃ পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজিতন্ত্রকে।

প্রকৃতির নিয়ম বা কোড তাই যে কোনো বস্তুর গঠন, পুনঃর্গঠন, পরিবর্তন এর কোড হচ্ছে বিজ্ঞান। তাই, কোনো কিছু আপঃত দৃশ্যমান না হলেও কার্যত বস্তুটি যা ঠিক তাহাই উদ্ঘাটন করে বিজ্ঞান । অতঃপর, বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যানুসন্ধানী ও সত্য উদ্ঘাটনকারী। তাই, বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত সত্য। সুতরাং, বিজ্ঞানে কোনো অন্ধত্ব নাই বরং বিজ্ঞান হচ্ছে আলো। অতঃপর, গুরুজীদের কথিত দিশা ও জীবন পাড়ি দেওয়ার নির্দেশিকা মতো যারা জীবন-যাপন করবে তারাই,অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি। তাই, তাদের মিথ্যা ও অন্ধত্বের শিকার তথা অনালোকিত ,অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারচ্ছন্ন, গোড়া না হওয়ার

কারণ নাই। তবু, আদি গুরুজীদের হালের খলিফারা হাতে মোবাইল নিয়ে ফেবু সমেত নানান মিডিয়ায় এবং মন্দির সহ নানান স্থান ও আসরে ঢালাওভাবে নছিহৎ বা প্রচারণা চালিয়ে প্ররোচিত করার জন্য বলে বেড়ায় যে, আদি গুরুজীদের বিবৃত ও হালের গুরুজীদের ব্যাখ্যাত নিদান-বিধান মান্য ও পালন করলে কথিত আলোকিত মানুষ হতে সক্ষম হয়ে মানুষের নানান তরফের ও নানান সময়ের জীবনে সকল প্রকার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভে সফল হবে। সুতরাং, দাসতান্ত্রিক আমলের এমনতরো বোধের গুরু-বাণী মান্য ও পালন করাই হচ্ছে জীবনের মোক্ষলাভের উপায় বলে যারা মানে, তারাই দাসোচিত চিন্তার ব্যক্তি বটে। অতঃপর, দাসোচিত চিন্তার বিনাশকারী মজুরদেরকে যদি নানান তরফের গুরুজীর মায়াজালে আচ্ছন্ন করা যায় তবেতো টিকে থাকতে পারবে বটে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী। এই রূপ বদ মতলবে দেশে দেশে বা নানান প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার আশ্রয় নিয়ে পুঁজিতন্ত্রের সেবকরা দাসযুগীয় প্রভুদের চালুকৃত নানান আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন-উদযাপন করার কথিত উৎসাবাদিতে মজুর শ্রেণীকে যুক্ত করে দাসোচিত চিন্তায় আচ্ছন্ন ও প্ররোচিত করতে নানান অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

শাসনে দয়া-মায়াহীন তাই ভয়ানক নিষ্ঠুরতো বটেই উপরন্ত শাসককে হতে হবে অতি চালাক, খুবই চতুর, ভয়ানক ধূর্ত, ভয়ংকর দুরন্ধর, হিংস্রতায় নিকৃষ্ট ও হত্যায় অসম্ভব রকমের পারদর্শী তাই বীর হতে হবে যে কোনো শাসককে, আর শাসকের শাসন, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, প্রথা- ঐতিহ্য ইত্যাদি পালনে বা অমান্যে চরম দন্ডের ভীতি ও মান্যতায় নানান ধরণের প্রাপ্তির লোভ-প্রলোভন দিয়ে দাসদেরও দাসত্বের জীবনকে মেনে চলা ও দাসপ্রভুদের সব ধরণের সেবা করা তথা হুকুম তামিল করাকেই খোদ দাসদেরও দাসত্বের জীবন সফল ও স্বার্থক হবে রূপ নানান তত্ত্ব কথা, বাণী, বিধান-নিদান জারী ও চালু করেছিল দাসতন্ত্রের প্রবর্তক-সংরক্ষক হাম্মুরাবি, মনু, মুসা প্রমুখ। মেকিয়াভেলী বা চানক্যও কিন্তু অমন বিধানাবলীর নিদান-ই দিয়েছেন। যদিও, চানক্য, ঈশ্বরে বা দেব-দেবতায় বিশ্বাসী

ছিলেন না। কিন্তু, দাসতন্ত্রের, পূর্বে দেব-দেবতা বলে কোনো বিষয় মানুষের কল্পনায়ও ছিল এমনটা নজির বা প্রমাণ কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি।

কিন্তু, ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বা উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় বা ম্যাইথোলজিকেও বৈজ্ঞানিকভাবে বিবচেনা করলে এটাই অনেকের নিকট বিশেষত যারা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতি তথা বিজ্ঞানী তাদের নিকট নিশ্চিত হয় যে, দাসপ্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ন্যায্যতাও বৈধতা দিতেই রাজা-বাদশাদেরকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা তথা ডিভাইন রাইটহোল্ডার বলে প্রতিপন্নকরণে ১টি মাত্র পৃথিবীর ১ বিলিয়ন ১শত জন স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও ধ্বংসকারী যারা আবার কেহই এমনকি পৃথিবীর আয়তন, ব্যাস বা ব্যাসার্ধ, ভর, ওজন, গতি এই সব কিছুই জানত না, বা জানতো না তারা যে, সূর্যেকে কেন্দ্র করে পৃথিবীও ঘুরে বটে সূর্যের চার দিকে,অথবা, জানতো না তারা, কেবল পুরুষের বীর্য বা শুক্রানু নয় বরং নারীর ডিম্বানু যে নতুন মানুষ সৃজনে-উৎপাদনে আবশ্যক তাও। উল্লেখ্য, নারীর ২৩টি ও ২৩টি ক্রোমোজেম পুরুষের মোট এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজম হতেই নতুন মানুষের জন্ম হয় এটাতো প্রমাণিত হল মাত্র ১৯৫৬ সালে।

বলা হয় গুরুজীরা বা মতদার্শিকরা বা দার্শনিকেরা হচ্ছে মহা জ্ঞানী বা কেউ কেউ সর্বজ্ঞ। কিন্তু, সক্রেটিস কি জানতেন বস্তুর সবচাইতে ক্ষুদ্রতম অংশ অনু বিষয়ক তত্ত্ব বা এরিষ্টোটল বা প্লেটো কি জানতেন গ্রাভিটেশন বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা বৃক্ষতলে বসে বোধিপ্রাপ্ত বৌদ্ধ কি জানতো যে গাছেরও প্রাণ আছে বা চীনের কনফুসিয়ার্স কি জানত পুঁজির সূত্র বা গোপন রহস্য বা হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক হ্যানিম্যান কি জানতেন কোষ তত্ত্ব বা নিউটন কি জানতেন হালের বিমান বা নিদেন পক্ষে রেল বা সড়ক পরিবহনে মোটর যান বিষয়ে অথবা আইন্সষ্টাইন কি জানতেন হালের আইসিটি? না। কিন্তু,এখনকার শিশুদেরও অনেকেই এসব বিষয়াবলী জানে বটে। তাহলে, জ্ঞান বা মহা জ্ঞান বা বোধ বিষয়ে কি

আগেকার উল্লেখিত ব্যক্তিদের চেয়ে হালের বহু শিশু বেশী জ্ঞানী নয়। আসলে, জ্ঞান নয় বরং প্রকৃতি সহ বহু বিষয়ে পুঁজিতন্ত্র যে সকল তথ্য-উপাত্ত উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন করেছে তা জানার সুযোগও অনেক শিশুর আছে বলেই এই শিশুরা সাবেকী বহু জ্ঞানী-গুণি গুরুজীদের তুলনায় বেশী জানে। অতঃপর, হাল আমলেও মানুষে মানুষে জানা-বুঝার মধ্যে যে ফারাক বা তফাত বিদ্যমান তার জন্য দায় ও দায়ী বটে ব্যক্তিমালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানা জনিত তফাত। কাজেই, হালের পুঁজিতন্ত্রই নিশ্চিত করছে যে কথিত মহাজ্ঞানী বা গুরুজীদের ভয়ানক অজ্ঞতা ও অনাবিশ্যকতা।এই অনাবশ্যক তবে ভয়ানক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পরজীবী গুরুকুলকে তাদের চালুকৃত-সৃজিত সকল রাজনীতি, মতবাদ ও দর্শন ইত্যকার বিষাক্ত জঞ্জালকে চিরতরে বিদায় জানাবে বটে কেবলমাত্র একাকী স্বশ্রমজীবী মজুরশ্রেণী ।

গুরুর অনুগামিরা, গুরুদের বাণী, বিধান-নিদান জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলবে, নিজ নিজ গুরু ছাড়া বাদ-বাকী গুরু ও গুরুদের চেলা-ছামুন্ডা ও শিষ্যদেরকে শত্রু জ্ঞান করবে। দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপ, তথা, কারা কি কাজ করবে, কখন কখন করবে, কি খাবে বা খাবে না, বা কখন কখন কি খাবে বা খাবে না, মিলন বা যৌন সংগম নয় বরং স্ত্রী সংগম কখন কখন করবে, কি ভাবে করবে, স্বামির শষ্য ক্ষেত রূপী স্ত্রীরা স্বামির আহবানে সাড়া না দিলে কি কি সাজা দিতে হবে, কে কি ধরণের পোষাক কিভাবে পরবে, সম্পত্তিতে কার কতটা অধিকার বা মালিকানা থাকবে, সম্পত্তির মালিক মারা গেলে কারা উত্তরাধিকার হবে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের অভিভাবক কে কে হতে পারবে, কে মারা গেলে কি কি আচার আচরণ ও অনুষ্ঠান করতে হবে এই সবই গুরুজী-সাঁইজিদের তথা রাজনীতিকদের নিদানে-বিধানে বর্ণিত বটে। এসব নিদান, বিধি-বিধান, নিয়ম- আচার অমান্যে ও ভংগে " চোখের বদলে চোখ' বা জীবনের বদলে জীবন- এইরূপ নীতি কার্যকরণের নীতিতেই গুরত্বারোপ করে সেসব বিধি-বিধান অমান্য ও ভংগের দায়ে অভিযুক্তকে দোষী সাবস্ত করে সাজার ধরণ মতো

কয়েদ করা, চাবুক মারা, হাত কাটা বা পাথর নিক্ষেপ বা জীবন্ত মাটি চাপা দেওয়া বা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা হাল আমলে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকরণের কার্যত প্রতিহিংসাপরায়নতার প্রতিশোধ গ্রহণের নানান আইন-কানুন চালু করেছে কার্যত ব্যক্তিগত সম্পত্তিওয়ালাদের তথা দাসপ্রভুদের স্বার্থ সংরক্ষায়। প্রকৃত অন্যায়কারীদের অন্যায় ও অন্যায্য তথা পরজীবীতার স্বার্থ সংরক্ষায় প্রণীত সকল মতাদর্শ, আইন ইত্যাদি কার্যত কেবল চরম অন্যায় ও অমানবিকই নয় বরং মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির বিরোধী ও বৈরী। মানুষ ছাড়া পশুকুলের আর কোনো প্রজাতি এমন অসভ্য ও বর্বর ক্রিয়াদি তথা রাজনীতি করছে না। অতঃপর, রাজনীতি হচ্ছে সকল অন্যায় ও অন্যায্য নীতিমালার মধ্যে সুপ্রীম নীতি আর রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে দমন-পীড়নের জন্য সংগঠিত একটি শক্তি। সেই জন্যই রাজনীতিকদের নিষ্ঠুর ও নির্মম হওয়ার বিধান দিয়েছেন চানক্য সমেত গুরুজীদের অনেকেই।

সর্বরোগহর বটিকা স্বরূপ মতাদর্শ বা গুরুবাণী বা রাজনীতির প্রবর্তক গয়রহ সর্ব বিষয়ে বিশারদ কার্যত জগত-জীবনের উদ্ভব বিষয়েও অজ্ঞ তবে ভন্ড অতঃপর, স্ব-ঘোষিত ঐ ধরণের গুরুজী-সাঁইজিরা কার্যত রাজনীতিকরা যতোই নিজেদেরকে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তি বলে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান বলে দাবী করুক না কেন, আসলে তারা সকলেই দাসতন্ত্রের সৃজন-পত্তন ও দাসতন্ত্রকে বহাল ও স্থায়ী করার নিমিত্তে যে সব বিষয়াদি বলা-কয়া ও বিধি-বিধান জারী ও চালু করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল সেসব বিষয়ে আবশ্যকীয় মতামত, বিধি-বিধান দিয়েছিলেন। তাই, বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো মতবাগিশ বা দার্শনিকের বা গুরুজীর চিন্তা, পরিকল্পনা বা ডিজাইন মতো দাস সমাজতো নয়ই বরং কোনো সমাজই গঠিত-নির্মিত হয়নি। যদিও, লেনিনবাদীরা সহ নানান জাতের এমনকি পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতিকরাও তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে বা সংরক্ষায় হর-হামেশাই দাবী করে যে, তাদের মহান গুরু বা নেতার নীতি-পরিকল্পনা বা চিন্তা মতোই তারা তাদের সমাজ/দেশকে

গড়ে তুলছেন, এগিয়ে নিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে, পুঁজিতন্ত্রও যেহেতু শোষণভিত্তিক সমাজ তাই এই সমাজের তথা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষায় দাসতন্ত্রের গুরুজী/সাঁইজি, বা মতবাগিশ বা দার্শনিকদের মতোই নিজেরদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সত্য নয় জানিয়েও সত্য মর্মে এই সব মিথ্যাচার বা বানোয়াটি গাল-গল্প জাহির করে। তাই,একালের হলেও কার্যত, এরাও দাসতন্ত্রের রাজনীতির আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন বলেই এরাও জাত-জাতির নায়ক বা অত্যাচারিতের মুক্তির দাতা-ত্রাতা খেঁজে, যেমন প্রত্যেক দেশের লেনিনবাদীরা খোঁজে তাদের দেশের জন্য একেক একজন লেনিন বা মাও বা কিম বা ফিদেল বা চে'কে।

দাসতন্ত্রের আবশ্যকতায় সৃজিত ও প্রবর্তিত রাজনীতিকে সেকালের গুরুজী/সাঁইজিদের কেহ কেহ তাদের কথিত তুলনাহীন প্রতিভাদৃপ্ত মতবাদ, দর্শন বলে যেমন জাহির করেছেন তেমন তাদেরই কেহ কেহ এসবকে ধর্ম হিসাবে বিবৃত করেছেন। এসব বিষয় সম্বলিত পুস্তকাদিকে ধর্মীয় পুস্তকও বলেছেন তাদের কেউ কেউ, যেমন দুনিয়ার প্রথম ধর্মীয় পুস্তক হচ্ছে মিশরের ফারাও ডাইনেস্টী প্রতিষ্ঠাকারীদের " বুক অব পিরামিড" বা মৃতের গ্রন্থ। অতঃপর, গুরুজী বা সাঁইজিদের বা মতবাদিক- দার্শনিকদের দর্শন ও মতবাদ গুলো যে তাদের ইচ্ছেমতো তৈরী করেছে তা নয় বরং বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে তাদেরই পরজীবিতার জন্য সুবিধাজনক দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে বহাল ও কার্যকর রাখতে তথা মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করার মতো নিকৃষ্টতম বর্বরতার মাধ্যমে পরজীবিতা তথা তাবৎ পরজীবীদের স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষায় নিদান-বিধান বা নীতি-নৈতিকতা বা বাণী বিশেষ যাহাই সৃজন করেছেন তা কোনো বিশেষ মস্তিষ্কের ততোধিক বিশেষ প্রতিভার কোনো বিশেষ কর্ম নয় বরং বাস্তবতার প্রতিফলনে ও নিরীখে তৈরী তবে স্বার্থান্ধতা প্রসুত বলে মতবাদ বা দর্শনগুলো যেমন কালক্রমে অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে ও হচ্ছে তেমন মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করার মতো অমানবিকতার সর্বোনিকৃষ্ট ধরণের ক্রিয়াকে বজায়-বহাল ও

চিরস্থায়ীকরণে শোষিত ও শাসনাধীন মানুষকে দমন-পীড়ন করার আবশ্যকতায় সৃজিত আইন-কানুন, বিধি-বিধান, বা তদানুরূপ নিদানাদিও বাস্তব হলেও কার্যত কৃত্রিম। তাই, মিথ্যা। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষে সৃজিত সকল পুস্তকাদি কেবলই মিথ্যার বেশাতিতে পূর্ণ।

তাই, এই সব বই-পুস্তক কেবল মিথ্যাচারের বান্ডেল বিশেষ মাত্র। তবে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়াদি যেমন কৃত্রিম বা মিথ্যা হওয়ার সুযোগ নাই, তেমন ব্যক্তিমালিকানা বিনাশ ও বিলোপের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত পুস্তকাদিও বিজ্ঞান বলেই কৃত্রিমতা বা মিথ্যাচারের কবল মুক্ত। তাই, এই সব পুস্তক হচ্ছে প্রকৃত তথা সত্য বিষয়ে সত্য। সুতরাং, এই সকল পুস্তকের লেখকগণ কেহই নয় গুরু, বা দার্শনিক বা মতবাগিশ বরং সকলেই বিজ্ঞানী। অতঃপর, পুঁজির গোহন রহস্য তথা নিয়ম এবং সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম আবিস্কারের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কর্তা মার্কস বা কমিউনিজমের বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ও তথ্যাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী তথা মার্কসের বন্ধু এ্যাংগেলস বিজ্ঞানী বৈ দার্শনিক বা মতবাদ বিশেষের সষ্ট্রা নয় বা নয় তারা গুরু বা মাওয়ের মতো জাতি বিশেষের শিক্ষক তবে মজুরের মুক্তির শর্তে কেবল মজুর শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারী তাই তারা ছিলেন কমিউনিস্ট। পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি-কমিউনিজম একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ বলে কমিউনিস্টারাও গুরু বা নেতা নয় বরং কমিউনিস্ট মাত্রই বিজ্ঞানী ও বন্ধু।

গুরুজীরাই শোষক শ্রেণীর প্রভুত্ব, কর্তৃত্বকে বিশেষত, শাসকদের নিষ্ঠুতরা নৃশংস শাসনকে বৈধতা দিতেই " মানব প্রকৃতি হচ্ছে অপরাধ প্রবন" তাই, কথিত অপরাধী মানবকে শাসনে বশীকরণ করে দুষ্টের দমন ও শীষ্ঠের পালনে নির্দেশিকাও দিয়েছেন। অথচ, আইন ভংগের নামই অপরাধ। তাই, আইন-কানুন যখন ছিল না, তখন আইন ভাংগার কোনো প্রশ্নও ছিল না। তাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি পত্তনের আগে যেমন মানব জাতির মধ্যে মানুষের সৃষ্ট আইন-কানুন ছিল না, তাই, অপরাধও ছিল না। ফলে, মানবজাতি অপরাধ প্রবণ গুরুজী ও

দার্শনিকদের এমন বক্তব্যও ভুয়া। এরূপ ভুয়া বক্তব্য না থাকার কালে তথা আদিম সমাজে না ছিল অপরাধ, না ছিল দন্ড বা শাস্তি, না ছিল শাসক, না ছিল শাসিত, না ছিল গুরুজী বা সাঁইজি, না ছিল অবতার বা না ছিল দার্শনিক বা মতবাদের স্রষ্টা, বা পুরোহীত বা রাজনৈতিক। সুতরাং, মানব জাতির প্রথম শ্রেণী বিভক্ত সমাজ– দাসতন্ত্র হতেই সৃজিত হল রাজনীতি, আইন, অপরাধ, দন্ড, যুদ্ধ, খুন, ধর্ষণ, মতবাদ, দর্শন ইত্যকার বিষয়াদি।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ কালে ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত ডাঃ এন্ডরিয়াস ভেসালিউস কর্তৃক লিখিত বই –*Abridgement of the Structure of the Human Body*, more commonly known as the *Epitome*, হতেই মানব জাতি প্রথম মানবদেহ বিষয়ে প্রমাণিত প্রাথমিক তথ্যাদি প্রাথমিক ভাবে জানতে পারে। অতএব, ১৫৪৩ সালের পূর্বে কেহই মানবদেহের অংগ–বিন্যাস বিষয়ে যথার্থভাবে কিছুই জানত না। অথচ, দাসতন্ত্রের গুরুজি /সাঁইজিরা সত্য নয় জানিয়োও মিথ্যা–মিথ্যিভাবে তবে কেবলই রাজনৈতিক কারণে মানব দেহের নানান অংগের ভুয়া বা অবৈজ্ঞানিক নামাকরণ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং রাজনৈতিক কারণেই কতিপয় অংগকে বিশেষ বিশেষ লিংগ বলে চিহ্নিত তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভাজন ও বৈষম্য তৈরী করতে সহায়ক হিসাবে ঐসব অংগর ক্রিয়াদিতো বটেই উপরন্ত চোখ–মস্তিষ্ক বা হার্ট ইত্যাদির গঠন–ক্রিয়াদি সম্পর্কেও ভয়ানক ভুয়া–বানোয়াটি গাল–গল্প তৈরী করে শরীরের নানান অংশকে কেবলই লজ্জা বা শরমের অংগ বলে চিহ্নিত করে একালে সেই সব বাসী–অচল ধারণাপুষ্ঠ লোকেরা এমনকি, এই সব অংগের নানান অসুস্থ্যতায়ও এমনকি চিকিৎসকের নিকট খোলা–খোলিভাবে আলোচনা করতে পারে না বলে এসব অংগের নানান রোগ–ব্যাধির যাতনা ও যন্ত্রণা নিয়েই জীবনপাত করে। নিজের দেহ বিষয়েই যদি নিজেরই প্রাথমিক ধারণা না থাকে তবে শরীরের যথার্থ পরিচর্যা ও যত্ন করা যাবে কি করে?

স্নায়ুতন্ত্রতো জানার সুযোগই হয়নি সেই দাস বা সামন্ততন্ত্রের গুরজি বা মহা জ্ঞানী কোনো সাঁইজির, ১৮৩৯ সালের আগে জানতনা কেহ কোষ তত্ত্ব, বা ১৮৫৯ সালের আগে বিবর্তন তত্ত্ব। তাই, কার্যত, ১৮৩৯ সালের আগে যেমন নিস্প্রাণ পদার্থ হতে স্বপ্রাণ –কোষ তথা জীবনের উদ্ভব হয়েছিল তা জানত না কেহ তেমন ১৮৫৯ সালের আগে প্রাণীর বিবর্তন ও বিকাশ বিষয়েও জানার সুযোগ ছিল না কারোই। উল্লেখ্য, একজন বয়স্ক মানুষের দেহে ৭৫ ট্রিলিয়ন সেল থাকতেই পারে। কিন্তু, প্রতিটি সেলে একটি ব্যাটারি–এটিপি আছে। তাই, প্রতিটি সেলই জীবন্ত এবং অনেকগুলো সেল নিজেই নিজেকে তৈরী বা রূপান্তরিত করে থাকে। অতঃপর, হার্ট বা হৃদয় যা কেবল দেহে রক্ত সঞ্চালন সিস্টেমকে সচল রাখতে, চিন্তা করতে সক্ষম শরীরের একমাত্র অর্গাণ মস্তিষ্কের নির্দেশনায় ও নিয়ন্ত্রনে একটি পাম্প মেশিন হিসাবে কাজ করে। মস্তিষ্ক বা হার্ট – এগুলিও বিলিয়ন বিলিয়ন সেলের সমষ্টি বটে।তাই,একটি হার্টেই কেবল ১টি প্রাণ নয় বরং প্রত্যেকা মানুষের হার্টেই আছে বটে অসংখ্য প্রাণ। আর মানব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্গাণ– গ্ল্যান্ড বিষয়ে জানার কথাই নয় সাবেকী আমলের কোনো গুরুজীর। অতঃপর, গ্ল্যান্ডকুলোর উৎপন্ন নানান হরমোন বিষয়ে একদম অজ্ঞ অথচ দেহ বিষয়েও মহাবিজ্ঞতার দাবীদার গুরুজিরা মস্তিস্কের ক্রিয়া না বলে মানুষের কথিত সুকর্ম ও দুস্কর্ম সব কিছুকে হার্টের কাজ বলে ফতোয়া দিয়ে কথিত সকল প্রাকার কুকর্মকে মন্দ হার্টের মন্দ কাজ বলে তা হতে বিরত রাখার নিদান –বিধান দানকারীদের 'মহাত্মা' বলে চিহ্নিত করে এমনকি রক্তের রসায়ন, গঠন ও কার্যাবলী বিষয়ে জানার সুযোগহীন হয়েও হরমোনের বাহক রক্তকে গোত্র ও বংশের সম্পর্ক লতিকা বলে সেই ভিত্তিতে একের সাথে অপরের সম্পর্ক নির্ধারণ করে কতিপয়কে কতিপয়ের বংশধর বা উত্তরাধিকার বা কতিপয়ের সাথে কতেকের মেলা–মেশা করা বা না করার নিদান দিয়ে কার কার সাথে কে কে সংগমে রত হতে পারবে বা পারবে না তারও বিধান দিয়েছে।

এরাই, নারী রূপে যাদেরকে সনাক্ত ও চিহ্নিত করেছে তাদের প্রাকৃতিক কারণেই ঘটা মাসিক রক্তস্রাব দেখতো বটে কিন্তু জানতো এর কারণ। জানতো না তারা নারীর ওভারি –যাতে উৎপন্ন হয় ডিম্ব। তাইতো, পুরুষের "বীর্য" যা মোটেই রক্ত নয় বরং নানান গ্ল্যান্ডের তৈরীকৃত নানান হরমোনের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত একটি হরমোন তাকেই ভুয়াভাবে রক্ত বলে চিহ্নিত করে নবজাতককে পিতার রক্তজাত সন্তান বলে পিতার বংশ পরিচয়ের পরিচয় দিয়ে ফতোয়া দিয়েছে। এই সব ফতোয়া মতো মাকে তথা স্বীয় ওভারীতে নিজ ডিম্বানু সহ মোট ২৩ জোড়া ক্রোমজমকে ধারণ ও বহন করে নব জাতকের জন্ম দেওয়া ব্যক্তিটিকে এমনকি, সন্তানের অভিভাবকের মর্যাদাও দেয়নি।

অথচ, পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের কালে বিজ্ঞানের বিকাশে এখন জানা গেছে যে মায়ের ডিম্বানু না হলে তথা মায়ের ২৩ টি ক্রেমাজোম না হলে নতুন শিশুর জন্মই হয় না। তাইতো, জন্মসূত্রেও মানুষ প্রত্যেকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজম হতে উৎপন্ন বলে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে সমান। অতঃপর, বৈষম্য–বৈরীতার সম্পর্কাধীন ' নারী' ও 'পুরুষ' বোধ বা পরিচিতি যে কেবলই দাসতান্ত্রিক রাজনৈতিক বোধ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয় তাওতো পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থায় নিশ্চিত হয়েছে। পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় কথিত নারী ও পুরুষ ব্যক্তিগণ একই সাথে যুক্ত ও জড়িত হচ্ছে। তাই, খোদ পুঁজিতন্ত্রই ' এল জি বি টি' অধিকার কেবল স্বীকারই করেনি বরং তা সংরক্ষা সহ নানান দেশের নানা স্থানে খোলা–মেলা সম্পর্ক সহ পোষাকহীন দেহে চলা–ফেরার অধিকারও কবুল করেছে। উল্লেখ্য, আইসল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঔষ্টযধহহধ ঝরমঁৎশ্চধৎফষ্টঃঃরৎ তো বিবাহের ইতিহাসে দুনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রিক ক্ষমতাধর নারী যে সমকামি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে যখন তার প্রথম পুত্রের বয়স ছিল ৪৩ বৎসর। আর ক্রোশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কোলিন্দা গ্রাবারতো স্বঘোষিত লেসবিয়ান।

এটা নিশ্চিত যে, কথিত কোনো মহান নেতা বা মহান শিক্ষকের শিক্ষা বা নেতৃত্বের কারণে নয় বরং পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের

শর্তাদির কারণেই খোদ পুঁজিতন্ত্রে বসবাস করেই দুনিয়ার বহুলোক তাবৎ গুরুকুলের তাবৎ ফতোয়া বা নছিহৎ অমান্য, অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে মানুষে মানুষে সমতার বোধ বিষয়ক চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছে তেমন এলজিবিটি রাইট সহ খোলা-মেলা মিলন বা পোষাকহীন চলা-ফেরার অধিকার ভোগ করছে। ভাংগছে বিয়ে, টিকছে না পরিবার যা গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় তবে, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি-সমাজতন্ত্রে পরিবার নয় বরং ব্যক্তিই হবে সমাজের সর্ব নিম্ন ইউনিট। ফলে, প্রত্যেকেই এমনকি পারিবারিক শৃংখলেরও বন্দীত্ব মুক্ত।তাই, সকলেই যেমন সমান মর্যাদার তেমন প্রত্যেকেই মুক্ত ও স্বাধীন প্রত্যেকের কাজ কর্মে এমনকি ভালোবাসা-বন্ধুত্ব ও মিলনেও তাতো নিশ্চিত করছে পুঁজিতন্ত্রই।

উপরন্ত, পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতির হালের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের যেটুকু বিকাশ সাধিত হয়েছে তাতে, সেক্স নয় বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যে মানুষে মানুষে সকল বিভাজন, বৈষম্য ও বৈরীতার কারণ তাওতো বুঝতে কোনো মজুরের প্রয়োজন হচ্ছে না কোনো গুরু বা মাওয়ের মতো কোনো 'মহান" শিক্ষকের। বরং, সমাজতন্ত্রে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানা নাই বলেই সমাজতন্ত্রে কোনো শোষণ নাই, তাই, শোষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে কোনো গুরুজী/নেতা রূপ পরজীবীও থাকার কোনো কারণ নাই বরং সক্ষম দেহের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা মতো সামাজিক উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত থাকবেন বলে কেনা-বেচা মুক্ত পরিবেশে নিজের জন্য আবশ্যকীয় সকল জিনিষ নিবেন। তাই, সমাজতন্ত্রে কেহই শোষিত নয় বলে শোষিতকে শাসনে এ যাবৎ গড়ে উঠা কোনো আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য সমেত কোনো মতাদর্শ বা দর্শন থাকার উপযোগিতা নাই বিধায় এই বিষয়াদিকে প্রয়োগ ও কার্যকরণে থাকবে না কোনো রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র, এন জি ও এবং পুঁজিতন্ত্রীদের স্বার্থে সৃষ্ট ও পত্তনকৃত কোনো বৈশ্বিক সংগঠন ও সংস্থা।

তবে, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করার জন্য নয় বরং সামাজিক উৎপাদনকে সমন্বয় ও আবশ্যকীয় যোগাযোগের ব্যবস্থাকে কার্যকর রাখতে থাকবে বটে এক বিশ্ব সমিতি। ২০১২ সালে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদসহ কমিউনিস্ট ইস্তেহারের ৫৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই যে, " ইহার শ্রেণীগুলো ও শ্রেণীবৈরীতা সহ পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাব একটি সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ।"

১৮৮০ সালে রচিত ও প্রকাশিত এবং ১৯৭০ সালে প্রগতি প্রকাশন , মস্কো, আই এস এস আর হতে বাংলায় প্রকাশিত এ্যাংগেলস তার " সমাজতন্ত্রঃ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক" বইয়ে এই বিষয়েও যেমনটা বলেছেন এ্যাংগেলস তা এইঃ " লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা।" কাজেই, কোনো ধরণের গুরু বা নেতা বা বীরতো নয় এমনকি সমাজতন্ত্রী বলে ভুয়াভাবে পরিচিত লেনিন বা মাওয়ের মতো কোনো নেতা, গুরু বা চে'র মতো কোনো বীরের স্থান যে সমাজতন্ত্রে নাই তাওতো নিশ্চিত।

সামন্ততন্ত্রেও সামন্তদের স্বার্থ সংরক্ষায় দাসতন্ত্রের সৃজিত-প্রবর্তিত বহু আইন-কানুন, রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য সমেত গুরুজী-সাঁইজিদের কার্যালয় তথা মন্দির,আশ্রম ইত্যাদিকে রক্ষণা-বেক্ষণ, লালন-পালন ও পরিপোষণ করা হয়েছে। গুরুজীদের উপযোগীতাও ছিল। কারণ, পুঁজিতন্ত্রে যেমন বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে তেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে অজ্ঞাত পৃথিবীকে আবিষ্কার করা সমেত পৃথিবীর ভর-ওজন, আয়তন, গতি ইত্যাদিই কেবল আবিষ্কৃত হয়নি বরং মহাবিশ্বের জন্ম, এর বয়স, মহাবিশ্বের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন তারকা বা সূর্যের অবস্থান ও অস্তিত্বও আবিষ্কার করেছে; প্রাণ-প্রাণী এইসবের জন্ম রহস্যও উদ্ঘাটিত, মানব জাতির বয়স ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বয়স সমেত আইন-কানুন, অপরাধ-শাস্তি ইত্যকার বিষয়াদির বয়স সমেত শ্রেণী বিভক্ত শেষ ও চূড়ান্ত সমাজ-পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি- শ্রেণীহীন, শোষণহীন, শাসনহীন, অপরাধহীন, দন্ড বা শাস্তিহীন, রাজনীতিহীন,

দর্শন ও মতবাদহীন এক অখন্ড মানব জাতির সমাজ- সমাজতন্ত্র এর তত্ত্ব-সূত্র আবিষ্কার সমেত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে খুব সহজেই মানবজাতির উদ্ভাবিত তথ্যাদি পাওয়া যায়; বুর্জোয়ারাই বুর্জোয়া অর্থনীতির উপযুক্ত ও দক্ষ মানব শক্তি তৈরীতে পত্তন করেছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার, যাতে জীব, রসায়ন, পদার্থ, চিকিৎসা, পরিবশে বিজ্ঞান সমেত নানান বিষয়ে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, গবেষণা, অনুসন্ধান করা হয়; বুর্জোয়া শ্রেণীই আধুনিক রাজনৈতিক দল, আধুনিক রাষ্ট্র সমেত রাষ্ট্রের ক্ষমতা-এখতিয়ার ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনৈতির আবশ্যকীয় নানান বৈশ্বিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে; এবং মুদ্রিত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যকার নানান মিডিয়া তৈরী করছে কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত- (১) পুনুরুৎপাদন; এবং (১) সঞ্চালন স্বার্থে এবং খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে তথা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির এবং তাতে উৎপাদনের সম্পর্কাদি এবং সেই সংগে সমাজের পুরো সম্পর্কের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ করে বিধায় পুঁজিতন্ত্রে জানা-বুঝার মতো প্রতিষ্ঠানাদি বা সুযোগ-সুবিধা বা পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়াই যেমন মানুষে মানুষে সমান এই রূপ চিন্তা করার সুযোগ তৈরী করেছে তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা অন্ধকারময়-বর্বরতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতায় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যাচারের রাজনৈতিক ধারণায় ভর-পুর দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রে ছিল না।

ফলে, জীবন-যাপনের অনেক অনেক পণ্য যেমন পুঁজিতন্ত্রে পাওয়া যায় তেমন জগত-জীবনকে জানা-বুঝার তথ্যাদিও পাওয়ার জন্য সাবেকী আমলের কোনো সাঁইবাবা, গুরুবাবার শিক্ষা-নির্দেশিকতা বা নির্দেশনা যেমন আবশ্যক নয় তেমন আবশ্যক নয় কোনো গুরুজী বা সাঁইজির। তাই, মনু গোসাই, মুসা- স্বয়ং স্বীকৃত স্বীয় জাতির শিক্ষক, বা চীনা রাষ্ট্রের সংবিধান মূলে স্বীকৃত চীনা জাতির মহান শিক্ষক অথচ, দুনিয়ার নিকৃষ্টতম হত্যাকারীদের অন্যতম লেনিনবাদী মোড়ল- মাওয়েরও কোনো আবশ্যকতা নাই মজুর শ্রেণীর।

শ্রেণীগত অবস্থান যেমন শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকের চিন্তার নিয়ন্ত্রক তেমন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির কালেও কোনো ব্যক্তিই নয় শ্রেণী মুক্ত। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিদ্যমান অবস্থান ও শর্তাবলীর শর্তেই অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণী নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনকালে নিজের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে চিন্তা করে তেমন যতোই পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রের হালের মরণ দশার কালেও দাসতন্ত্রের রাজনীতির খড়-কুটাকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চায় বলে পুঁজি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনে অযোগ্যতার দাসোচিত চিন্তার বটিকা বিশেষ তথা দাসতন্ত্রের রাজনীতি তথা সাবেকী সেসবের অনুকূলে, অনুগমনে নানান আচার-আচরণ বা দাসতন্ত্রের কালের রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ বা কথিত নৈতিকতা বা সংস্কৃতি বা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের আদি কালের ধারণাদির ব্যবহার ও জন্ম-মৃত্যু দিবসের নানান আচার-আচরণ অনুসরণ বা সাবেকী আমলের গুরুজি/সাঁইজির জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতো বটেই নিজেদের এসব কথিত দিবস উদযাপনে ব্যাপক উৎসাহ ও উন্মাদনা ছড়িয়ে এমনকি, দৈনন্দিন জীবনে কারোই কোনো হের-ফের করার কারণ ঘটানোর মতো বিষয় না হলেও নব-বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে উদযাপনকারীদের অতীতের সকল দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা-অসুখ, অস্বচ্ছলতা দূরে ফেলে নতুন বছরে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি হবে রূপ রাজনৈতিক গল্প ফেঁদে নব-বর্ষকে তারা স্বাগত জানাতে তখনকার শোষক শ্রেণী নানান আয়োজনের প্রথা চালু করেছিল। যদিচ, বছর শেষে দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের রাজা-বাদশাদের বার্ষিক আয় চূড়ান্ত হতো বলে বিনা শ্রমে অর্জিত আয়ের প্রাপ্তিতে তারা উৎসাহ বোধ করে কথিত উৎসবাদি করতো বটে তবে শোষকদের উৎসবের খরচ যোগাতে গিয়ে কেবল কষ্টকর জীবনের দায় বহনই নয় বরং চাষীদের কেউ কেউ দেশান্তরীও হয়েছিল। কিন্তু, হালেও এই সব ভুয়া উৎসবাদি কেবল পুঁজি বা অর্থ-বিত্ত বা সুখ-শান্তি বিষয়ে ভুয়া, অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণারই প্রসার ঘটাতে যেমন সহায়ক তেমন কথিত উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পণ্যাদি বেচা-কেনা হয় বলে পুঁজির

সঞ্চালনও বাড়ে। ফলে, একালের শোষক পুঁজিপতিরা তাদের কবর খোদক মজুর শ্রেণীকে জীবন-জগত তথা পুঁজি বিষয়ে অন্ধকারে রেখে মজুরি দাসদের মুক্তির লড়াই করার চিন্তা হতে দূরে সরাতে পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেই কথিত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি হাসিলের ভুয়া বোধ উস্কিয়ে দিবাস্বপ্নের ঘোরে মরিচিকার পেছনে দৌড়ানোর রেসে রেখে দেওয়ার রাজনৈতিক বোধে প্ররোচিত করতে এবং পণ্যের বেচা-কেনা বাড়িয়ে পুঁজির সঞ্চালন বাড়াতে নববর্ষ পালন সহ কথিত উৎসাবাদির প্রসার ঘটাতে সরকারী ছুটি ও ভাতা দেওয়ার প্রচলন করা সমেত সকল মিডিয়াকে ব্যবহার করে মহা কলরবে মহা আয়োজন করে যাচ্ছে।

কার্যত, পুঁজিতন্ত্রের এই কালেও পুঁজিতন্ত্র বিনাশী মজুর শ্রেণীকে দাসতন্ত্রের রাজনীতি তথা জীবন ও জগৎ, জীবনের শুরু ও সমাপ্তি, আয়-রোজগার, ধন ও ধনী, সঞ্চয়-সমৃদ্ধি, সুখ-শান্তি ইত্যকার বিষয়াদি বিষয়ে গুরুজী/সাঁইজিরা যে সব ভুয়া, বানোয়াটি গাল-গল্প সাজিয়ে-গুছিয়ে চির সত্য মর্মে উপস্থাপন করে বিনা প্রশ্নে এইসব গুরুবাক্য মেনে সেমতে ক্রিয়াদি করলে জীবনের শেষে হলেও কথিত সৎ কর্মের পুরষ্কার ও দুস্কর্মের দন্ড বা সাজা ভোগার নিদানাদি তথা ভয়-ভীতি ও লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে দাসদেরকে দাসোচিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করার ড্রাগ হিসাবে কাজে লাগিয়েছে সেই ঘুম পাড়ানির চিন্তা তথা কোনো বিষয়ে কাউকে বিশেষত শোষক-শাসকদের অবস্থানকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে কেবলই দাসোচিত চিন্তায় আচ্ছন্ন মজুরেরা যাতে তাদের শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি অনুগত থাকে সেজন্য কত না প্রাণান্তকর চেষ্টা-অপচেষ্টা করছে।

এটা ঠিক যে, মানুষে মানুষে বিভাগ-বিভাজন সৃষ্টি করেও আবার শোষিত শ্রেণীকে বর্ণিত অসমতা-বৈষম্য ইত্যাদি বুঝতে না দিয়ে শ্রেণী বৈরীতা ও শ্রেণী সংঘাতের শ্রেণী বিভাজিত সমাজের শোষক শ্রেণীকে স্থায়ী রাখতে জাত-জাতি, জনতা ইত্যকার সেবক রূপী রাজনীতিকদের বা গুরুজীদেরকে শ্রেণী সমঝোতা ও শ্রেণী সমন্বয়ের বিষয়াদিকে ব্যাপকভাবে গ্রাহ্যতা দিতে; এবং ঠিক-ঠাক মতো কোনো

বিষয় না জেনেও কেবলই শোষকশ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থে বিষয়টি যথার্থ হিসাবে বলা বা সত্য নয় জেনেও অসত্য বিষয়াদিকে সত্য মর্মে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপন করা বা সত্য জানিয়াও সত্যকে গোপন করার মতো দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করেইতো রাজনীতি বা গুরুগীরি করতে হয়েছে তাবৎ রাজনীতিক ও গুরুদের। তাই,পেশাগত কারণেই এই সব বিষয়ে অন্যান্যদের বিশেষত অধস্তনদের এবং শোষিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের চেয়ে গুরুজীদের একটু বেশী মাত্রায় চিন্তা করতে হত বলে সাধারণ হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা দাসতন্ত্রের গুরুজীরা যে একটু বেশীমাত্রায় চিন্তক ছিল তা ঠিক।

শোষকদের ভোগ–দখলী অন্যায় ও অযৌক্তিক সুবিধাকে ন্যায় ও যুক্তি সংগত সুবিধা হিসাবে চিহ্নিত ও বিবৃত করতে তথা গুরুজীরা সমেত তাবৎ পরজীবীদের সুযোগ বহাল রাখতে গুরুজীদের সৃষ্ট শিক্ষা, দর্শন, মতবাদ বা মতাদর্শ ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে বলা–কওয়ার আবশ্যকতায় গুরুজীরা কথিত ধ্যানে মগ্ন হতেন আসলে নিবীড়ভাবে চিন্তা করতে হত বলে পেশাগত কারণেই গুরকুল চিন্তার ক্ষেত্রে তীক্ষ্মতা দেখাতে পারতেন। কিন্তু, তাদের পেশাগত শর্তাধীন চিন্তার তীক্ষ্মতাকে ডিভাইন রাইট দাতাদের দান বলে সব গুরুজীরাই নিজেদেরকে কেবল মহাজ্ঞাণীই নয় বরং অসাধারণ প্রতিভা–মেধার অধিকারী বলে জাহির করতে লজ্জা বোধ করেনি এবং এখনো করেনা বটে এমনকি, সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম করার ভুয়া দাবীদার লেনিনবাদীরাও।

তাই তারা তাদের নেতা, গুরু বা শিক্ষকদের তেমন ধরণের নানান তকমায় অভিহিত করে কথিত মহান শিক্ষক ও বড্ড ক্ষমতাধর নেতাদের অতুলনীয় প্রতিভার বা মেধার নানান বানোয়াটি বয়ান করতেও লজ্জা না করে বরং মেধা বা প্রতিভা বিষয়ক সেসব ভুয়া মতবাদের প্রসার সাধনে লেনিন সহ কারো কারো মৃতদেহ মমি করেই রাখেনি বরঞ্চ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ উত্তর কোরিয়ার কিম

ডাইনেস্টির জাতীয় সংগীতও রচনা করেছে নেতাদের গুণকীর্তণ করে।

অথচ, পুঁজিতন্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের যেমন সূচনা করেছে তেমন মানব দেহের গঠন-বিন্যাস এবং মানব দেহের নানান অংগ-প্রত্যগের ক্রিয়া-কলাপও জানতে-বুঝতে চেষ্টা করছে বটে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে এবং একই সাথে পুঁজিপতি শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকার শর্তেও। তাই, এখন মজুরও জানতে পারে বটে চিন্তা করার বা কোনো কিছু বুঝার বা কোনো বিষয় অনুভব করার বা কোনো রকম অনুভুতি প্রকাশ করার বা কি পরিস্থিতে কি করণীয় ও কি কি না করণীয় সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করার চিন্তাটিও করে বটে হৃদয় নয় বরং খোদ মস্তিষ্ক। এটাও এখন প্রমাণিত যে সমাজের বিদ্যমান অবস্থাই হচ্ছে সকলের চিন্তার উৎস। তাই, কেহই তার নিজস্ব বা বিশেষ প্রতিভার কারণে নয় বরং নিজ নিজ শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তা করে। এটাও প্রমাণিত যে, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও কোনো বিশেষ প্রতিভাবান বা মেধাবান ব্যক্তির মস্তিষ্কজাত বা মেধাজাত কোনো বিষয় নয় বরং পুঁজিতন্ত্রে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ভিতের উপর দাড়িয়ে ও পরম্পরা বজায় রেখে আরেকটি আবিস্কার করছে সংশ্লিষ্ট বিষয় সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য-সূত্র বিষয়ে জানা-জানির সুযোগে , যেই সুযোগ সৃষ্টি করেছে খোদ পুঁজিতন্ত্র।

প্রকৃতপক্ষে, কম্পিউটারের মতোই যে মানুষ তার নিজ মস্তিষ্কে যে সব তথ্য- উপাত্তের যোগান পায় সেই সব জানা তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বের ভিত্তিতেই চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।কম্পিউটারে জমাকৃত তথ্য মুছে দেওয়া যায় কিন্তু, কোনো ধরণের দুর্ঘটনার শিকার না হলে মস্তিষ্কে রক্ষিত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু, কম্পিউটার সমেত হালের আই সি টি'র যুগেও পুঁজিপতি শ্রেণী এখনো তাদের সৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতিতেও কথিত মেধা তালিকা প্রকাশ করে বটে সেই দাসতান্ত্রিক গুরুজিদের ফতোয়া মতো। পুঁজিপতি শ্রেণীও শোষক বলেই দাসোচিত চিন্তার বাহক।

তবে, মস্তিস্কে নিউরণ কোষ ব্যতিত যে আর কোনো প্রতিভা বা মেধা নামীয় কোনো কোষ নাই তাতো পুঁজিতন্ত্রের শ্রেণীগত সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতার শিকলে বন্দী চিকিৎসা বিজ্ঞানই নিশ্চিত করেছে। আবার, **অর্থ বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, পণ্যে তথা মূল্যে তাই উদ্বৃত্ত-মূল্যে তথা পুঁজিতেও আছে বটে প্রতিভা বা মেধা নয় বরং শ্রম।** তাই, কথিত মহান গুরুজীদের মহান বা অসাধারণ প্রতিভা বা মেধা নয় বরং শ্রমই হচ্ছে মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি। অতঃপর, পুঁজি গঠনে, পণ্য উৎপন্নে প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক হলেও কারো বিশেষ প্রতিভা বা অসাধারণ মেধা নয় বরং বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক হচ্ছে মনুষ্য শ্রম তথা মজুরি শ্রম।

তৎসত্ত্বেও, শোষিত মজুর শ্রেণীর শ্রম ও শ্রমের গুরুত্বকে স্বীকার না করে একালের পুঁজিপতিরাও শোষকদের শোষণমূলক দুস্কর্মাদিকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতার নিয়োজিত তাবৎ গুরুকুলের কথিত প্রতিভা বা মেধার গুণ-কীর্তণ করে বেড়ায় সেই দাসতন্ত্রের দাসদেরকে যেমন দমন-পীড়ন ও অবদমনে মেধাহীন অভিশপ্ত গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করেছিল তেমন এরা এই পুঁজিপতিরাও পুঁজির স্রষ্টা-মজুরদেরকে প্রতিভাহীন, মেধাহীন গর্ধভ বলে কেবল তিরস্কারই করে না বরং কেবলই গাধার মতো বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিতেও কার্পণ্য করতে লজ্জা না করেই নিজেদের বিত্ত-বৈভব ও ক্ষমতাকে তাদের নিজ নিজ প্রতিভা বা মেধার কেরামতি বা চর্চা বলে অভিহিত করে। অতঃপর, কথিত প্রতিভাধারী বা মেধাবীরা যেমন মূল্য উৎপন্ন না করেও কেবলই ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে সম্পূর্ণ অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে পুঁজির মালিক তেমন তারা স্বার্থান্ধতার বোধের বানোয়াটি মূলে সৃজিত কথিত প্রতিভা বা মেধার ভুয়া তকমাধারী বটে।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী স্বার্থে যুদ্ধ তথা ঠান্ডা মাথার পরিকল্পিত সংগঠিত হত্যাযজ্ঞ, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি সংঘটনে পিছপা হয় না এমনকি তারা পরস্পরকেও হত্যা করে, পরস্পরের পুঁজি হরণ করে, তেমন মজুর শ্রেণীও তার মজুরির

শর্তে দৈনন্দিন কাজ করে। ফলে, ব্যাক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক, বিশাল বহরের এক দংগল পরজীবী সমেত পুঁজিতন্ত্রে দাসতান্ত্রিক রাজনীতির তথা গুরু ও গুরুবাদের উপযোগিতা থাকলেও খোদ পুঁজিতন্ত্রই যে বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ সাধন করেছে সেই বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধায় কমিউনিস্ট মার্কসও পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। মজুর শ্রেণী বিজ্ঞানের নানান শাখা সহ কমিউনিজমের বিজ্ঞানের বিষয়াদিও জানা-বুঝার সুযোগ পেয়েছে। তদুপরি, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির শৃংখলের আষ্ট্রে-পৃষ্ঠে বন্দী হলেও সাধারণত মজুরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায় তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত স্বার্থান্ধতার দৃষ্টিভংগি হতে মুক্ত দৃষ্টিতে সমাজ ও সমাজের মানুষে মানুষে বিদ্যমান সম্পর্ক ও বিষয়াদিকে খোলা-খোলি দেখার সুযোগ পায়। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের হেতুবাদে যে মজুরেরা শোষিত, বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত তাও বুঝতে পারার সুযোগ পায় পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা হতেই। তাই, শোষিত-নির্যাতিত বলেই মজুর শ্রেণী শোষণ-পীড়ন হতে মুক্ত হওয়ার চিন্তা করে। এক কথায় মজুরের জীবন-ই মজুরকে মজুরি দাসত্ব হতে মুক্তির জন্য চিন্তা করার মাল-মশল্লা যোগায়।

পণ্য উৎপন্ন করেও মজুর উৎপন্ন পণ্যের মালিক নয় বরং উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা লাভের সুযোগ পায় বটে পুঁজিপতি। তাই, পণ্যের দামের অধিকারী বটে পুঁজিপতি। ফলে,মুল্য উৎপন্ন করেও পণ্যের সমুদয় মূল্য লাভে বঞ্চিত হয় বটে মজুর বরং পুঁজিপতি হাসিল করে বটে উদ্বৃত্ত-মূল্য যা কেবল মাত্র মজুরের উৎপন্ন। তাই, পণ্য উৎপাদনী পদ্ধতিতে পণ্য উৎপন্ন করেই মজুর হয় শোষিত আর পণ্যের মালিক-পুঁজিপতি হচ্ছে শোষক। শোষণের হেতুবাদেই শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ-বৈরীতা হচ্ছে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনের কারণে। ফলে, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনের জন্যই খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট মুজর শ্রেণীর সহিত পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈষম্য, বিরোধ ও বৈরীতামূলক মূলক সম্পর্ক হচ্ছে পুঁজি, পণ্য ও

মজুরের জন্মগত শর্তে। তাই, পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম যেমন স্বাভাবিক বিষয় তেমন পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি তথা পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর বৈষম্য ও বৈরীতামূলক সম্পর্ক নিরসন করাও অসম্ভব, যতোই পুঁজিপতি শ্রেণীর রাজনৈতিক মোড়লরা তথাকথিত মানবতাবাদের ফেরি করুক বা আই এল ও'র মতো বৈশ্বিক সংস্থা গঠন করে কার্যত রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্ষেত্রবিশেষ হানি করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিপীড়নের সর্বশক্তিমান হাতিয়ার- খোদ রাষ্ট্রকে সালিশ কারীর ভূমিকার দৃশ্যত হাজির করে মালিক-শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার নানান ফতোয়া দিক।

শোষণের কারণেই মজুর ভোগে তাবৎ দুর্ভোগ ও দুর্দশায়। আবার পুঁজিপতি শোষণের সুবিধা পায় বটে উৎপাদন ও বিনিয়ের উপায়াদির ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে। উৎপাদন ও বিনিময়ের নানান উপায়ের মালিকানা গ্রহণ করে খোদ রাষ্ট্র যখন সরাসরি শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। বুর্জোয়াদের আইনেই ব্যক্তি তথা পারসন বলতে রাষ্ট্রকেও বুঝায়। তাইতো, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিমালিকানার পরিমাণ কম থাকলেও বা ক্ষেত্র বিশেষ না থাকলেও পুঁজি উৎপন্নে শোষক পুঁজিপতির মতোই খোদ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি তথা এর নির্বাহী বিভাগ পণ্য উৎপন্নে মজুরের শ্রম-শক্তি ক্রয় করে থাকে। ফলে, ব্যক্তি পুঁজিপতি যেমন মজুরকে শোষণ করে পুঁজি তৈরী করে তেমন রাষ্ট্রটিও। তবে, ব্যক্তি পুঁজিপতি মজুরের শ্রম-শক্তি ক্রয়ে এককভাবে শ্রম-শক্তি বেচা-কেনার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খোদ রাষ্ট্রটি একচ্ছত্রভাবে পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই, ব্যক্তি পুঁজিপতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি অধিকতর হারে মজুরদেরকে শোষণ, দমন-পীড়ন করে। তাইতো, এখনো যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ফিদেল-চে'দের কিউবা বা কিম ডাইনেস্টীতে শোষণের হার বেশী তেমন ভন্ড লেনিনেন সোভিয়েত ইউনিয়নেও শোষণের হার ছিল যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। অতঃপর,

ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রই মজুরের যেমন শোষণ তেমন দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের কারণ তেমন রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রও মজুরদের অধিকতর শোষণ, দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের কারণ। ব্যক্তি পুঁজিপতিকে শোষণ বজায় রাখতে তাদেরই সর্বশক্তিমান দমনমূলক হাতিয়ার- রাষ্ট্রের নিকট যেতে হয়, ধর্ণা দিতে হয় কিন্তু, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজেই একটি দানবীয় হাতিয়ার তাই, রাষ্ট্রটি নিজেই শোষিত মজুরদেরকে দমন-পীড়নে সিদ্ধহস্ত। ব্যক্তি পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রীক ব্যবস্থায় মজুরি নির্ধারণে মলামূলি করা সহ শিল্পে ছাঁটাই-নিয়োগে মজুরদের যৌথ দর কষাকষির বিধান কার্যকরণে ধর্মঘটেরও অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মজুরদের মনোনীত কার্যত ক্ষমতাসীন দলের চেলা-চামুন্ডা জাতীয় পরজীবীদের কর্তৃত্বাধীন যৌথ দর কষাকষির সংগঠন কেবলমাত্র মজুরদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কার্যক্রমে মতামত প্রদানকারী। মূলত, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রও পুঁজিতন্ত্রেরই একটি রূপ বা ধরণ। লেনিনবাদীরা, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকেই সমাজতন্ত্র বলে রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়ে এবং লেনিনবাদী রাষ্ট্রের এদ্বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত গোপন রেখে বাকী দুনিয়ার মজুরদের সামনে শোষণমুক্তি সহ কম মূল্যের ক্যান্সার টিকা আবিষ্কার সমেত নানান ধরণের উন্নতি ও মানবিকতার গাল-গল্প প্রচার ও প্রসারে এমনকি, বুদ্ধিজীবী নামে খ্যাত পুঁজিলোভীদের ভাড়া করে আসছে।

পণ্য উৎপাদনে শ্রম-শক্তি ক্রেতা পুঁজিপতিই কেবল মজুরের শোষক নয় বরং পুঁজিপতির মালিকানাধীন পণ্য বিক্রিকারীরা সমেত অসংখ্য পণ্যের পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাষ্ট্র সমেত অন্যান্য সংগঠন, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্তে ব্যবহৃত দাসতন্ত্রের চরম বিষাক্ত রাজনীতি সমেত পুঁজিতন্ত্রের মৃত গণতন্ত্রের রাজনীতি চর্চাকারী নানান ধরণের গুরু/শিক্ষক/বুদ্ধিজীবি বা নেতা জাতীয় অগণন ব্যক্তি যারা গৃহ হতে কর্মস্থল, খেলার মাঠ হতে বাজার, নৌকা হতে বিমান, মঠ-মন্দির বা আশ্রম, এবং নানান ধাঁচের নানান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে তাবৎ মিডিয়ায় শব্দ দূষণ করে হলেও ব্যক্তি মালিকানা সংরক্ষায় ক্রমাগত বিজ্ঞান বিরোধী তথা

দাসতান্ত্রিক রাজনৈতিক বোধের প্রচারণা দ্বারা মজুর শ্রেণীকে চিন্তার দূষণেও আক্রান্ত করে বিভ্রান্তি করার দুস্ক্রিয়াদি করেই যাচ্ছে। আবার কথিত সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক কার্যত সমাজতন্ত্র বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পুঁজির সেবক ভন্ড –প্রতারক লেনিনের দোহার গয়রহ ও কথিত মানবাধিকার রক্ষক সাজা বহুজুন এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও কথিত সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে প্রত্যেক গরীবকে ধনী বানানোর খোয়বের ফেরিয়ালারা যেমন মজুরকে স্বীয় শ্রেণী পরিচয় ভুলে শ্রেণী স্বার্থকে অস্বীকার করে কেউ কেউ জাত–জাতির সদস্য বানাতে তৎপর আবার কেউ কেউ ফালতু মানবধিকারভোগী হতে প্ররোচনা দিচ্ছে তারা সকলেই মজুরের শোষক শ্রেণীর নানান কিছিমের সেবক ও গোলাম।

দেশপ্রেম, জাতি প্রেম, ভাষা প্রেম, নারীবাদ,বর্ণবাদ, লেনিনবাদ সহ নানান মতবাদ, দর্শন ইত্যকার নানান কিছিমের আদর্শবাদের পুরোহিত/গুরুজীরা বা মোড়লরাও শোষকদের অংশী বটে। শোষণে সহায়ক হাতিয়ার লেনিনবাদ –যা হচ্ছে কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ তাকেও লেনিনবাদীরা লেনিনীয় মতবাদ বা দর্শন বলে অভিহিত করে গুরু লেনিনের চিন্তা ও শিক্ষা বাস্তবায়নে কথিত আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক বনার ছবক দিয়ে বেড়ায় খোদ মজুর শ্রেণীকে। কারণ, একটাই মজুর শ্রেণীকে মজুর হিসাবেই রেখে দিয়ে শোষণের বখরা নেওয়া।

মজুরের কোনো দেশ নাই, জাতি নাই তবে তাদের জয় জয় করার মতো আছে একটি বিশ্ব এমন বক্তব্য বিবৃত করা সমেত দর্শন ও দর্শনের পরিণতি বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত এইঃ " ধর্ম, দর্শন, ও সাধারণভাবে একটা আদর্শিক অবস্থান হতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তৈরীকৃত অভিযোগ গভীর পরীক্ষার উপযুক্ত নয়।" এবং একই পুস্তকে আরো বিবৃত এইঃ "প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব; আশ্চর্য নয় যে ইহার বিকাশ প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদে জড়িত। " –২য়

পার্ট। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার রচনা করেছেন মার্কস ও এ্যাংগেলস, ১৮৪৭ সালে আর এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে।
এ্যাংগেলস তার "সমাজতন্ত্রঃ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক" বইয়ে যথার্থভাবেই লিখেছেন যে– " রাণীর মতো যা বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের শাসনাধিকার দাবি করে আসছিল তেমন কোনো একটা দর্শনের প্রয়োজন আর নেই।"
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরও লেনিনবাদীরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনীয় রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র বলে এখনো জাহির করছে অথচ, পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের বিষয়ে এ্যাংগেলস তার একই পুস্তকে লিখেন– " আধুনিক উৎপাদন–শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে তবে উৎপাদন ও বন্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলোর জয়েন্ট–স্টক কোম্পানী, ট্রাষ্ট্র, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই নির্বাহ হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেন্ট পকেটস্ত করা,কুপন কাটা, আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত–জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবলিম্বেই নয়।
কিন্তু, জয়েন্ট–স্টক কোম্পানি বা ট্রাস্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন–শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট–স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বঃতই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন–পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাহাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রীক জাতীয় পুঁজির একটি আদর্শ

রূপমূর্তি। উৎপাদন–শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে উঠে জাতীয় পুঁজিপতি, ততবেশী অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি–শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারীয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কেও অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু, চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন–শক্তির রাষ্ট মালিকানা সংঘাতের সমাধান করে না, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল শর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।
এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন শক্তির সামাজিক চরিত্রের সংগে উৎপাদন, দখল, ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠছে সেই উৎপাদন–শক্তির ওপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দখল স্থাপন করেই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন– উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকেই বানচাল করে দেয় অন্ধ বলাৎকারী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু, সমাজ কর্তৃক উৎপাদন–শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন–উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়িক ধ্বংসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনেরই প্রবলতম এক কারিকা। ”
প্রগতি প্রকাশনীর লেনিনীয় বিকৃতি প্রবণতা আঁছ করতে একই প্রকাশনীর ইংরেজীতে প্রকাশিত একই বইয়ের উদৃতাংশ মিলিয়ে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট অংশ এই ঃ “If the crises demonstrate the incapacity of the bourgeoisie for managing any longer modern productive forces, the transformation of the great establishments for production and distribution into joint-stock companies, trusts, and State property, show how unnecessary the bourgeoisie are for that purpose. All the social functions of the capitalist has no further social function than that of pocketing dividends, tearing off coupons, and gambling on the Stock Exchange, where the different capitalists despoil one another of their capital. At first, the capitalistic mode of production forces out the workers. Now, it forces out the

capitalists, and reduces them, just as it reduced the workers, to the ranks of the surplus-population, although not immediately into those of the industrial reserve army.

But, the transformation — either into joint-stock companies and trusts, or into State-ownership — does not do away with the capitalistic nature of the productive forces. In the joint-stock companies and trusts, this is obvious. And the modern State, again, is only the organization that bourgeois society takes on in order to support the external conditions of the capitalist mode of production against the encroachments as well of the workers as of individual capitalists. The modern state, no matter what its form, is essentially a capitalist machine — the state of the capitalists, the ideal personification of the total national capital. The more it proceeds to the taking over of productive forces, the more does it actually become the national capitalist, the more citizens does it exploit. The workers remain wage-workers — proletarians. The capitalist relation is not done away with. It is, rather, brought to a head. But, brought to a head, it topples over. State-ownership of the productive forces is not the solution of the conflict, but concealed within it are the technical conditions that form the elements of that solution.

This solution can only consist in the practical recognition of the social nature of the modern forces of production, and therefore in the harmonizing with the socialized character of the means of production. And this can only come about by society openly and directly taking possession of the productive forces which have outgrown all control, except that of society as a whole. The social character of the means of production and of the products today reacts against the producers, periodically disrupts all production and exchange, acts only like a law of Nature working blindly, forcibly, destructively. But,with the taking over by society of the productive forces, the social character of the means of production and of the products will be utilized by the producers with a perfect understanding of its nature, and instead of being a source of disturbance and periodical collapse, will become the most powerful lever of production itself.”

অতঃপর, মজুরী শ্রমিকদেরকে শোষণ করে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে ইউরোপের গরীব দেশ রাশিয়া পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির আরো বিকাশ সাধনে লেনিনের মোড়লীপনায় গঠিত প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষনাপত্র মূলে পুঁজিতন্ত্রী-প্রতিক্রিয়াশীল বলশেভিক পার্টির কতিপয় কেন্দ্রীয় নেতার পরিকল্পনায় রাতের আঁধারে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গুরু লেনিনের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র যে সমাজতন্ত্র নয় তাতো এ্যাংগেলেসের উপরোক্ত বিবৃতি দ্বারাও সুনিশ্চিত হয়।

পুঁজিতন্ত্রও সাবেকী দাস ও সামন্ততন্ত্রের মতোই ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক, শোষণ, দমন ও পীড়নমূলক সমাজ বলেই এখানেও রাজনীতি, রাষ্ট্র আছে, উপরন্ত পত্তন হয়েছে বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘসহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা, এবং রাজনৈতিক দল সমেত শোষক-পরজীবিদের আরো নানান সংগঠন-সংস্থা সমেত এদের মোড়ল-মাতুব্বর সমেত এক বিশাল পরজীবীর আধিপত্য-নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের এক অবৈজ্ঞানিক সমাজ। তবে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই বিজ্ঞানের সূচনা সমেত বিকাশ ঘটিয়ে কেবল পৃথিবী নয় বরং সৌরজগত সহ অপরাপর নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে গঠিত ইউনির্ভাসের উদ্ভব, বিকাশ, গতি ইত্যকার বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত হাসিল করেছে। আর এসকল বিষয় জানা-বুঝা, প্রচার-প্রকাশ করার জন্য পুঁজির অস্তিত্বের হেতুবাদে প্রতিষ্ঠা করেছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমেত নানান মিডিয়া। ফলে, জানা-শুনার সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে।

উল্লেখ্য, এত্তোসব ক্ষমতাধর বা মহান গুরুজী থাকা সত্ত্বেও যেমন দাসতন্ত্র টিকেনি তেমন সামন্ততন্ত্রও বিলীন হযেছে এবং থাকবে না বটে পুঁজিতন্ত্রও। কারণ, সমাজে সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে বটে ব্যক্তিমালিকানা নিজেই। অতিতের সমাজগুলোর বিনাশে ও বিলোপে কার্যকরী নিয়ম হচ্ছে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের সহিত বিরোধ ও বৈরীতাপূর্ণ উৎপাদন উপায়ের উদ্ভব হলে পরম ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা শ্রেণীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে তোয়াক্কা না করে পুরোনো সমাজের মধ্যে

উদ্ভাবিত উৎপাদনের উপায়ের উপযুক্ত সামাজিক সম্পর্কের উপযুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রাম তথা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সমাজ পরিবর্তনের এই নিয়মটি আবিস্কার করেছেন মার্কস। এককথায়, বিদ্যমান সমাজিক সম্পর্কের সহিত সমাজের মধ্যে সৃষ্ট নতুন নতুন উৎপাদনের উপায়/শক্তির বিরোধের পরিণতি হচ্ছে নতুন সমাজ।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণেই পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিরামহীনভাবে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপায়াদির বৈপ্লবীকরণ করতেই হচ্ছে। এটি করতে না পারলে পুঁজিপতি শ্রেণী , শ্রেণী হিসাবে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না। তাই, প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই, এই নীতির অধীন পুঁজিপতি শ্রেণী প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের নানান শাখার সূচনা ও বিকাশ সাধনে বাধ্য হয়েছে। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে নিত্যই নতুন নতুন পণ্য যেমন সৃষ্টি হচ্ছে তেমন উৎপাদনের অত্যাধুনিক হাতিয়ারদিও তৈরী হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছে নিরপেক্ষভাবে তবে অস্তিত্বের শর্তে।

আবার, পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত হচ্ছে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন–এটিও প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছে নিরপেক্ষ নিয়ম। এই নিয়মের অধীন পুঁজিপতি শ্রেণী কার্যত পুঁজির দাস । তাই, এই নিয়মমতো পুনরুৎপাদন করে সঞ্চালন সংকটে পড়তে হচ্ছে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীকে যাতে কেবল শ্রেণী হিসাবেই বিপন্ন হচ্ছে না মন্দাক্রান্ত পুঁজিপতি শ্রেণী বরং গোটা পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাটাকেই বিপন্নতার দরজায় হাজির করে ২টা বিশ্বযুদ্ধ করে তাবৎ দুনিয়ার মজুরদেরতো বটেই খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীরও নির্ণয় অযোগ্য অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেও বেশরমের মতো টিকে থাকে জন্মসূত্রে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিপতি শ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী চরিত্র হানি করে পুঁজিপতি হিসাবে প্রত্যেকের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার পরিবর্তে বেতনভুক কতিপয় কর্মচারীর প্রণীত নীতি ও কৌশল মতো চলতে বাধ্য করার বৈশ্বিক সিন্ডিকেট তথা আই এম এফ প্রতিষ্ঠা করে খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীর পত্তনকৃত আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও এখতিয়ার ক্ষুন্ন

করে কার্যত অন্তিম দশায় উপনীতি রাষ্ট্রকে ডিফাংক্ট রাষ্ট্রে পরিণত করেও মন্দা হতে রেহাই পায়নি মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের শাসনে অক্ষম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং ভবিষ্যতেও রেহাই পাবে না পুঁজিরই অস্তিত্বের শর্তে। আসলে পুঁজিপতি শ্রেণী তার শ্রেণী শাসনের সকল অস্ত্রপাতি তথা রাজনীতি সমেত রাষ্ট্র, আই এম এফ ইত্যাদি সহ সকল কিছু নিয়েই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিবে পুঁজিরই অস্তিত্বের শর্তে এই পুঁজিপতি শ্রেণীরই সৃষ্ট উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার কারণে তথা আধুনিক যন্ত্রপাতির সুষম ব্যবহারোপযোগী,যোগ্য ও উপযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতায়।তবে,শোষিত মজুর শ্রেণীর শ্রেণীগত ঐক্য তথা দুনিয়ার মজুরদের একতাবদ্ধ বলপূর্বক ক্রিয়ায় অর্থাৎ সমাজ পরির্তনের ঐতিহাসিক নিয়মেই।

প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিতন্ত্র এখন একটি অচল সমাজ। কারণ, পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি ব্যক্তি মালিকানার বিকাশতো নয়ই বরং ব্যক্তিমালিকানাকে ক্রমেই সংকোচিত করছে বটে পুঁজিতন্ত্র খোদ পুঁজিরই অস্তিত্বের শর্তে। এমনকি, দুনিয়ায় এ যাবৎকালের সর্বাধিক ক্ষমতাধর সংগঠন– আই এম এফ প্রতিষ্ঠা করেও মন্দার কবল হতে রেহাই পাচ্ছে না পুঁজিতন্ত্র। মন্দা হচ্ছে, আই এম এফ ব্যর্থ। বলা চলে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র কবরের নিকটে শুয়ে আছে। তবু, এই অচল, পঁছা–বাসী, ভয়ানক দুর্গন্ধ ছাড়ানো ও মারাত্মক বিষাক্ত পুঁজিতন্ত্র এখনো টিকে আছে। কারণ, পুঁজিতন্ত্রকে কপিন বন্দী করে কবরস্ত করার শক্তি – একাকী মজুর শ্রেণী একই লক্ষ্যে বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধ নয়। এবং প্রকৃত তথ্য হচ্ছে একই লক্ষ্যে একতাবদ্ধ করার জন্য গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের পরবর্তীতে তেমন কোনো কার্যকরী দল তথা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি, ১৮৯৬ সাল হতে কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা মজুর শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন অনুপোস্থিত।

উপরন্ত, মজুর শ্রেণীর মুক্তির নামে বা পুঁজিতন্ত্রের বিরোধীতা করার মোড়কে নানান মুখ রোচক ও রোমাঞ্চকর শ্লোগান দিয়ে দুনিয়ার মজুরদেরকে কেবল বিভ্রান্তই নয় বরং ভাগ–বিভাগ ও বিভক্ত এবং

দেশ-জাতির গন্ডী ও শৃংখলে বন্দী করে মজুরদেরকে কেবল দুর্বল করাই নয় বরং দেশ, জাতি, বর্ণ, লিংগ, ইত্যকার নামে দুনিয়ার মজুরদেকে পরস্পরের শত্রুভাবাপন্নকরণে ক্রিয়াশীল বটে নানান দল। আবার, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে গঠিত নানান দলের কোনো কোনোটি লেনিনবাদী আর কোনোটি দেশে দেশে কথিত সচেতন ভোটার তথা শিল্প পুঁজিপতি সমেত কৃষক এবং ছাত্র, যুবক ও মজুরদের ভোট বিপ্লবের নামে শান্তিপূর্ণ পন্থায় কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে তেমন কোনো অনুচ্ছেদ বা ধারা না থাকলে এককভাবে এক দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিবা স্বপ্ন ফেরি করছে।

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে এককভাবে কোনো দেশে বিনাশ ও বিলোপ করার সম্ভব নয়। তাই, বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিলীন ও বিনাশে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনে দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধকরণে মজুর শ্রেণীর একটি পার্টি বিকল্পহীনভাবে আবশ্যক। মজুর শ্রেণীর স্বার্থ বৈ ভিন্ন বা পৃথক কোনো স্বার্থ নাই বলে মজুরদের এই দলটি কমিউনিজমের নীতিতে পরিচালিত হবে বিধায় এই দলের সকলেই কমিউনিস্ট হেতু প্রত্যেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৈ নেতা ও কর্মী বা গুরু-শিষ্য রূপ সম্পর্কের অধীন হওয়ার কোনো কারণ নাই।

সমাজতন্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে দুনিয়ার পুঁজিপতি ও দুনিয়ার মজুরদের চূড়ান্ত বিরোধ; যার ফল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অর্থাৎ উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়াদির ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন ও যোগাযোগের সকল উপায়াদির সামাজিক মালিকানা তথা এই সবের উপর দুনিয়ার সকল মানুষের মালিকানা বা সাধারণ মালিকানার সমাজ- সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজি মুক্ত, পণ্য মুক্ত, মজুরি মুক্ত, বেচা-কেনা মুক্ত, টাকা মুক্ত, শোষণ মুক্ত, বৈষম্য ও বৈরীতা মুক্ত, শ্রেণী মুক্ত তাই এ যাবৎ কালে শোষক ও শাসক শ্রেণী কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সৃজিত ও চালুকৃত শ্রেণী শাসনের সকল অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তথা রাজনীতি, মতাদর্শ, দর্শন ইত্যকার বিষয় সহ রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র এবং পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায় সৃষ্ট সকল বৈশ্বিক সংস্থা মুক্ত। তবে, সমাজতন্ত্রে থাকবে বটে দুনিয়ার সকলের এক বিশ্ব সমিতি যা সমন্বয়

করবে সমাজের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় প্রোডাক্ট এবং এসব উৎপন্ন করবে বটে সকল বয়োঃপ্রাপ্ত কর্মোক্ষম মানুষ। তাই, ওখানে না থাকছে মজুর আর না থাকছে পুঁজিপতি বা শোষক তাই সেখানে থাকছে না শোষকদের সেবক পরজীবী কোনো গুরু। অর্থাৎ গুরুজীদেরকে গুড বাই জানিয়ে শেষত নিজেই ইতিহাস হবে বটে মজুরেরা তাদেরই প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে এক বৈজ্ঞানিক সমাজ যেখানে প্রত্যেকেই মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ সম্পূর্ণ মানবিক বোধে ভর পুর একটি অখন্ড অর্থাৎ একক মানবজাতির তথা প্রকৃতই মানুষ হয়ে উঠা মানুষদের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাময় মানুষদের নিরন্তর শান্তির এক নতুন সমাজ যা ক্রিয়াশীল থাকবে বটে পুঁজিতন্ত্রের বশীকৃত প্রকৃতিকে জয় করতে। অবশেষে, প্রকৃতিজাত মানুষ হয়ে উঠবে খোদ প্রকৃতিরই উপর কর্তৃত্বকারী চির সবুজ, সদা সতেজ ও সদা প্রফুল্ল চিরঞ্জীব মানুষ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটার আগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষার জন্য যেমন কোনো উত্তরাধিকারের প্রয়োজন হয়নি তেমনি কোনো উত্তরাধিকারীর পিতৃপরিচয়েরও আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। ফলে, উত্তরাধিকারীগণের অধিকার সমেত বৈধ-অবৈধ উত্তরাধিকার চিহ্নিত ও নির্ণিতকরণ সহ সেরূপ বিহীতকরণে আবশ্যকীয় বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পত্তনে কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ যেমন আবশ্যক হয়নি তেমনি প্রয়োজন হয়নি কোনো গুরুর। আবার, বার্ধক্যে বেঁচে থাকার জন্য কারোই নিজ নিজ সন্তানের উপর নির্ভর করার আবশ্যকতা ছিল না। তাই, কে কার নিজের বা পরের সন্তানরূপ ব্যক্তি বলে চিহ্নিত ও সনাক্তকরণের চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তির হেতুবাদেই সন্তানের গর্ভধারিণীদেরকে মহলবন্দি ' মহিলা' গণ্য করেই ক্ষান্ত হলে চলত না বলে মানবজাতির একাংশকে মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করে ওদের শরীর বিষয়ে নানারূপ মুখরোচক গাল-গল্প বানিয়ে যথার্থ না হলেও তাদের দেহের কতিপয় অংগকে যৌন উত্তেজক হিসাবে সনাক্ত করে কেবল সেসব অংগই নয় বরং নারীদের পুরো দেহকে আবৃতকরণের বিধি-

বিধান বানিয়ে নারীদের জীবনাচরণও কঠোর বিধি-নিষেদের আওতায় আনার আবশ্যকতা দেখা দেয়। তাই, গর্ভ ধারণকারীদের তাদের স্বামির সম্পত্তি রূপ গণ্যে নারী বা মহিলাদেরকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল বলে নিধান দিয়ে বস্তুত না হলেও মানুষের সেক্সকেই তেমন সবলতা ও দুর্বলতার কারণ সহ নারী-পুরষের বিদ্যমান সকল বৈষম্যের কারণ বলে নির্ণিত করে নারীদেরকে অসহায় ও অবলা রূপ চিত্রায়িত করে নারীদেরকে অবদমনে সহায়ক নানান মতবাদ সৃজনকারীদের কথিত অসাধারণ জ্ঞানের বহর কেবল শাসিতদের সাথেই অতুলনীয় নয় বরং মহাগুরুরা কেহই নিজেদের জ্ঞানের ও কেরামতির ক্ষমতা অপরাপর গুরজীদের জ্ঞান ও ক্ষমতার সাথে তুলানায়ও সম্মত ছিলেন না।

পুরষ সেক্সের দাস প্রভু ও দাস বা হালের বহু পুঁজিপতি ও বহু মজুর একই তথা সমসেক্সের লোক হওয়া সত্ত্বেও কেবল পুরুষ বলেই তারা কখনো সমান ক্ষমতার অধিকারী ছিল না বা সমান ক্ষমতার অধিকারী নয় সকল পুরুষ বা এ যুগেও বহু সম্পত্তিবান নারী তার কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে তার অধীনে কর্মরত অনেক অনেক পুরুষ অপেক্ষো ভয়ানক রকমের শক্তিমান ও ক্ষমতাবান তাহাই নয় বরং তারই শোষণের খোরক বহু নারীকেই কেবল নারী বলে পুরুষের তুলনায় কম মাত্রায় শোষণ করে তেমনটা নয় বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মজুরই পুরুষ লিংগের পুঁজিপতি দ্বারা যেরূপ শোষিত হয় তেমনটাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মজুর শোষিত হয়ে থাকে নারী পুঁজিপতির দ্বারাও। আবার, কেবলই সম্পত্তির পরিমাণের হের-ফেরের কারণেই সম্পত্তিবানদের সকলেই সমান ক্ষমতাধর নয় বরং অসংখ্য বৈষম্য পুঁজিপতিদের মধ্যেই বিরাজমান। আবার, সাঁওতাল সহ নানান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তিতে নারীর মালিকানা প্রথা এখনো চালু বিধায় সেসব সম্প্রদায়ে এখনো পুরুষের চেয়েও নারীই ক্ষমতাবান এবং নারী নয় বরং পুরষ নামীয় স্বামি বেচারাকেই থাকতে হয় স্বীয় স্ত্রীর অধীন।

তাই, সেক্স নয় মানুষে মানুষে ভেদা-ভেদের ও বৈষম্যের কারণ বটে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা- এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার ও গোপন করে ফতোয়াদানকারী গুরুকুল তথা কথিত মেধাবান বা প্রতিভাবানারাই যদি কেবল জ্ঞানী বা মহাজ্ঞানী হয়ে থাকেন তবে, প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজগুলোর বিশেষত দাস ও সামন্ত সমাজের এত্তো এত্তো গুরু-মহা গুরু যারা আবার তাদের দাবী মতো ছিলেন অসাধারণ ও অতুলনীয় প্রতিভাবান বা মেধাবান তারা কেন কেহই তাদের মেধার জোরে, মানব দেহের ৬০% বেশী বা বেঁচে থাকার জন্য এখনো বিকল্পহীন ক্যামিক্যাল - অক্সিজেনও আবিষ্কার করতে পারলেন না অথবা আবিষ্কার করতে পারেননি পানির কোড বা সূত্র তথা এইছ২ও অথবা, কত তাপমাত্রায় পানি বাস্পে বা বরফে রূপান্তরিত হয় তাহাও বলতে পারেনি বটে আদিকালের কোনো নামী-দামি গুরু বা মহা গুরু? আবার পুঁজিতন্ত্রের যুগেই কেন এত্তো এত্তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে এবং উদ্ভাবিত হয়েছে ও হচ্ছে অনেক অনেক নতুন নতুন পণ্য বা উদ্ঘাটিত হয়েছে ও হচ্ছে কেন সোলার সিষ্টেম সহ মানব দেহের সিষ্টেম বা মানুষের জন্মগত উপাদান? অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত তথা পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত তথা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরতিহীন বৈপ্লবীকরণ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণ নয় কি? পুঁজিতন্ত্রের বয়স এখনো ৮০০ বছর হয়নি কিন্তু, দাস ও সামন্ত সমাজ টিকে ছিল সাড়ে ৪হাজার বছরের কম নয়। অথচ, হত -দরিদ্র, প্রকৃতি-নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতির সামন্ততন্ত্রের তাবৎ গুরুকুল যে বিষয় চিন্তাও করতে পারেনি সেসব বিষয়গুলো এখন কেবল হাতের মুঠায়ইনি বরং আজকে যেসব পণ্য বা যন্ত্রপাতি নতুন কালকেই তার অনেক কিছুই বাসী বা অচল হয়ে যাচ্ছে অহরহ নিত্য-নতুন পণ্যের উদ্ভাবনে।

অতঃপর, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন কোনো মতেই কোনো বিশেষ বা অসাধারণ প্রতিভা বা মেধার ফসল নয় বরং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির কারণেই অনেকেই আবিষ্কার তথা

উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন করছে অনেক কিছু। যদিচ, নানান জন নানান কিছুর আবিষ্কার তথা উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবনে সক্ষম বা সফল হয়েও চিন্তার দিক থেকে গুরুবাদী থেকেছেন ও থাকছেন বটে ব্যক্তিগত স্বার্থ জনিত লোভে বা অজ্ঞতাবশত।

পুঁজিতন্ত্রের যুগে যতো ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা নতুন নতুন পণ্যাদির উদ্ভাবন হয়েছে সেসবের আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের আগে তদ্বিষয়ে তৎপূর্বে কেউ কোনো পুস্তকাদি লিখে নাই। তাহলে, এসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা নতুন নতুন পণ্যাদি যে বা যারা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেছে তারাতো কোনো গুরুজী বা কথিত শিক্ষা গুরুর নিকট তাদের নিজ নিজ আবিষ্কার তথা উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন বিষয়ে কোনো পাঠ নেওয়ার সুযোগ পায়নি। অথবা, প্রকৃতি বিষয়ে যেসব কোড ইতোমধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে সেসব কোডতো তৎপূর্বেকার কোনো মহান গুরু বা অসাধারণ মেধাবী বা প্রতিভাবান কেউতো লিখে রাখেনি। বরং প্রকৃতি বিষয়ে নানান গুরু নানান ভুয়া গাল-গল্পের বিবরণ রেখে গিয়েছিলেন বলেই এমনকি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এমন তথ্য প্রকাশ করার দায়ে বিজ্ঞানী ব্রুণোকে হাত-পা বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে কথিত মহান গুরুজীদের গুরুত্বপূর্ণ গুরুবাণীর নির্দেশিকা মতো। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকারকগণ বা বিজ্ঞানীগণ যে কোনো গুরুবাণী পাঠ করে, বা কোনো গুরুর কোনো বই-পুস্তক পড়ে তাদের নিজ নিজ আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন করেনি কিছুই তাতোও নিশ্চিত। আবার, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির কারণে আবিষ্কৃত, বা উদ্ঘাটতি ও উদ্ভাবিত বিষয়গুলো কোনো আবিষ্কারকই আবিষ্কার করতে সফল হতেন না যদি না পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবাদে ও কারণে প্রত্যেক আবিষ্কারক তার নিজ আবিস্কৃত বিষয়ে আবশ্যকীয় তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বাদি বিষয়ে প্রাথমিকভাবে না জানতেন তার নিজের পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের নিকট হতে। আবার, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার ২ শর্ত তথা- (১) পুরুৎপাদন; ও (২) সঞ্চালন জনিত কারণে পুঁজির বিশ্ববাজার দখল,

প্রতিযোগতামূলক বাজারে দ্রুততম সময়ে পণ্য ও পুঁজির গতায়তকরণে দ্রুতগতির যোগাযোগ মাধ্যম এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত– উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরতিহীন বিপ্লবীকরণ করার শর্তেই এযাবৎ কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ঘাটন করতে পেরেছে পুঁজিতন্ত্র বৈ অতীতের কোনো সমাজ তথা দাস ও সামন্ততন্ত্র নয়।

পুঁজিতন্ত্রও ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক সমাজ বলেই পুঁজিতন্ত্রে নানান ধরণের গুরুজীর অস্থিত্ব বিদ্যমান কিন্তু, দাস ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কোনো বিজ্ঞানী নয় বরং জন্ম দিয়েছে অনেক অনেক গুরু–মহাগুরুর। বিজ্ঞান হচ্ছে ক্রিয়াশীল তাই, দাস ও সামন্ততন্ত্রের গুরুজীরা বা তাদের মতাবাদ নয় বরং জয়লাভ করবে বটে বিজ্ঞান। কার্যত, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী বিলীন ও বিলুপ্ত হবে তেমন পুঁজিতন্ত্র বিজ্ঞানের সূচনা ও বিকাশ সাধন করলেও পুঁজিতন্ত্র নয় বরং জিতবে বটে বিজ্ঞান তাইতো, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র যেখানে বিজ্ঞানী বৈ গুরু–মহাগুরুর কোনো স্থান নাই।

প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞাত বিষয় হতে অজ্ঞাত বিষয় জানা বা পূর্বে যা ছিল অজ্ঞাত সে বিষয়ে জ্ঞাত হওয়াইতো কার্যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন। তাই, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই সেটি আবিষ্কারের ভিত্তি রচনাকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর দাঁড়িয়েই সংঘটিত হয়েছে। তাই, প্রতিটিই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই বিশ্বজনীন বৈ কোনো একক ব্যক্তির একক ক্রিয়া নয়। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইমপ্যাক্টও বিশ্বজনীন। সুতরাং, বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোও কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ, বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় কথিত মেধাবীদের স্বত্ত্ব স্বীকৃতি দানে পেটেন্ট রাইট চালু করে কেবলই অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে নয় বরং বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিরোধীভাবে সার্বজনীন বিজ্ঞানকে ব্যক্তির সম্পত্তি রূপ গণ্যে মজুরদের সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যকে ব্যাক্তির মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। উল্লেখ্য, গ্র্যাভিটেশন ও

আপেক্ষিকতার সূত্র যদি আবিষ্কৃত না হত তবে আজকের যুগে এয়ার টাইম বিক্রি করেও নানান জনই কেবলই ধনী হওয়া নয় বরং সরকারগুলোও এই খাত হতে যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করে তা করতে পারত না। পুঁজিতন্ত্রের আগেওতো লোকের মস্তিষ্ক ছিল কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রের যাবতীয় আবিষ্কারের কোনোটাই যে আগেকার কেউ আবিষ্কার করতে পারিনি তাতো যাবতীয় আবিষ্কারাদির রেকর্ডই নিশ্চিত করে। সুতরাং, কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ মস্তিষ্কজাত ক্রিয়া নয় বা কারো কোনো বিশেষ মেধা বা প্রতিভাজাত নয় বরং সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সূত্র হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের ফসল।

অতঃপর, কথিত মহাগুরু বা অসাধারণ প্রতিভাধরগণ যে অসত্য বৈ সত্যের পক্ষীয় নয় তাওতো অতিতের বিষয়াবলী প্রমাণ করে। আবার, কোনো আবিষ্কারকই তার আবিষ্কার বিষয়ে কোনো গুরু বা মহাগুরুর তামিল না নিয়ে এ যাবৎকালের সব কিছু আবিষ্কার, উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে কেবলই পুঁজিরই অস্তিত্ব রক্ষার শর্তাবলী অনুয়ায়ী যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উদ্ঘাটন ও উদ্ভাবন করেছে সে সবের জন্য উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বাদির যোগান পেয়েছিল বলে। তাই, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য যদি কোনো বিজ্ঞানীর তেমন কোনো বিশেষ গুরু বা মহাগুরুর তামিল নিতে না হয় তবে পণ্য উৎপাদনকারী মজুর শ্রেণী কেন তার মুক্তির বিষয়ে তথা শোষণহীন, বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শোষণের সাফাইদার কথিত গুরু বা মহাগুরুদের তামিল নিতে হবে? বরং, অমজুরদের অনেকের অনেক কিছু জানা-বুঝার আছে বটে খোদ মজুরদের নিকট হতে।

শাহ্ আলম।

২৮ জুলাই, ২০১৮ খ্রীঃ। ঢাকা।